KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher নাসির ওসমান
Title : চতুরঙ্গ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৪৮/২ ৪৮/৪ ৪৮/৫ ৪৮/৬	Year of Publication জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ ॥ Jun 1987 শ্রাবণ ১৩৯৪ ॥ Aug 1987 ভাদ্র ১৩৯৪ ॥ Sep 1987 আশ্বিন ১৩৯৪ ॥ Oct 1987
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রাউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

অগস্ট ১৯৮৭

"সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাজারের ভূমিকা" নিবন্ধে কঠোর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাজারের গতিকে ক্রিয়াশীল হতে দিয়ে ধনতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন ডেকে আনা হচ্ছে কিনা—এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন পশ্চিমবঙ্গ পরিকল্পনা পর্ষদের ডেপুটি চেয়ারম্যান দেবকুমার বসু।

বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কেমন করে সহায়সম্বলহীন গ্রামের মানুষদের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনছে, জাগিয়ে তুলছে তাঁদের সুপ্ত সৃজনশীলতাকে—তার কৌতূহলোদ্দীপক বিশদ বিবরণ অধ্যাপক জয়ন্তকুমার রায়ের তথ্যসমৃদ্ধ রচনায়।

ধর্ম, রাষ্ট্র আর শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার গভীর বিশ্লেষণ নিয়ে কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাথ"—যার প্রাসঙ্গিকতা এখনও অনস্বীকার্য। ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ থেকে পুনর্মুদ্রণ।

"বিদ্যালয়-স্তরে ইংরেজি শেখানো": কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালে পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজির চর্চা যে গভীর সংকটে নিমজ্জিত তার তথ্যভিত্তিক সমীক্ষা; সংকট-সমাধানের প্রস্তাব।

টিভির জগৎজোড়া সাম্রাজ্যবিস্তারের ফলাফল কী হতে চলেছে? তন্ময় দত্তর আলোচনা। বঙ্গসাহিত্যের প্রবীণতম কথাকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। গণসংগীতশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সাম্প্রতিক ধ্যানধারণা নিয়ে সাক্ষাৎকারভিত্তিক আলোচনা।

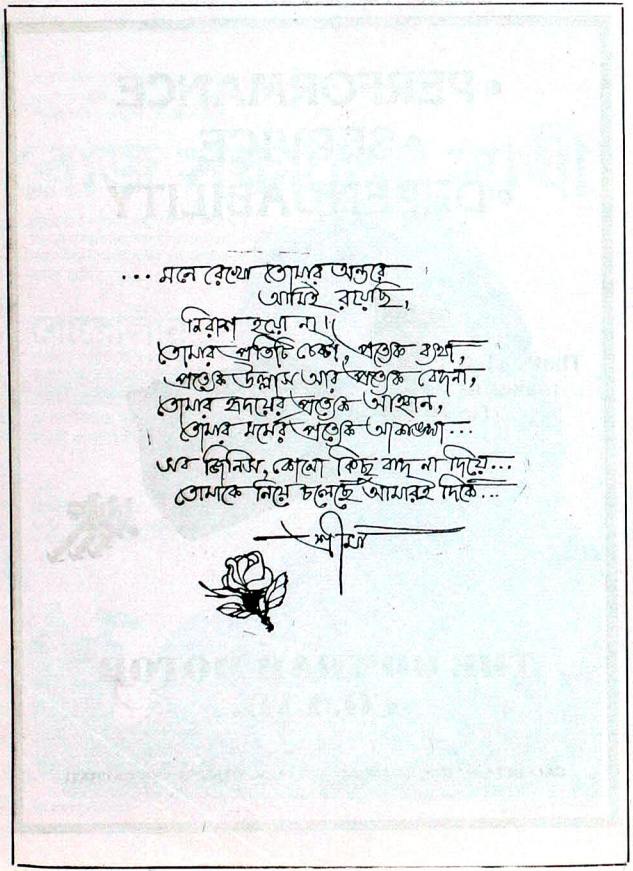

বর্ষ ৪৮। সংখ্যা ৪
অগস্ট ১৯৮৭
শ্রাবণ ১৩৯৪

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাজারের ভূমিকা দেবকুমার বসু ২৭৫
বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক জয়ন্তকুমার রায় ২৮৪
রবীন্দ্রনাথ কাজী আবদুল ওদুদ ২৯৯
বিদ্যালয়-স্তরে ইংরেজি শেখানো কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৭

ভ্রমণ সুরজিৎ ঘোষ ২৮০
দাঁড়িয়ে আছি মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ২৮১
পাখি শীতল চৌধুরী ২৮২
স্মৃতি গৌতম হাজরা ২৮৩

নিবারণ কেরানি ও ইহুদি মেনহুইন জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ২৯৩
অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৩১১

গ্রন্থসমালোচনা ৩২৬
অভেদ্যশেখর মুখোপাধ্যায়, হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, কামাল হোসেন,
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, প্যামেলা সরকার

সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি ৩৪০
বজ্রগর্ভ বাকস তন্ময় দত্ত

সাক্ষাৎকার ৩৫১
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপন শঙ্কর ভট্টাচার্য

সংগীত ৩৫৫
প্রসঙ্গ হেমাঙ্গ বিশ্বাস অভিজিৎ করগুপ্ত

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

THE OUDH SUGAR MILLS LTD.

Regd. Office :
Industry House
159, Churchgate Reclamation
BOMBAY-400 020

Head Office :
9/1, R. N. Mukherjee Road
'Birla Building'
CALCUTTA-700 001

SUGAR MILLS AT :

(1) P.O. HARGAON—261 121, Dist. Sitapur, U.P.

(2) **ROSA SUGAR WORKS**
P.O. ROSA—242 406, Dist. Shahjahanpur, U.P.

(3) **NEW SWADESHI SUGAR MILLS**
P.O. NARKATIAGANJ—845 455, Dist. Champaran, BIHAR
MANUFACTURERS OF PURE CRYSTAL CANE SUGAR

DISTILLERIES :
P.O. HARGAON—261 121, Dist. Sitapur, U.P.
P.O. NARKATIAGANJ—845 455, Dist. Champaran, Bihar
MANUFACTURERS OF POWER, INDUSTRIAL ALCOHOL & QUALITY SPIRITS

OIL MILLS & SOLVENT EXTRACTION PLANT :
HARGAON OIL PRODUCTS
P.O. Sitapur—261 001, U.P.
MANUFACTURERS OF GROUNDNUT OIL, SOLVENT EXTRACTED OIL & DE-OILED CAKE

CANNING FACTORY :
ALLAHABAD CANNING CO.
P.O. BAMRAULI—211 012 (Allahabad), U.P.
MANUFACTURERS OF CANNED FRUITS AND VEGETABLES

PAINTS :
MACFARLANE PAINTS
18, Radhanath Chowdhury Road, Calcutta-700 015
MAKERS OF VILAC & VALA PAINTS since 1919

BRANCHES AT DELHI & BOMBAY

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাজারের ভূমিকা

দেবকুমার বসু

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হল সমস্ত উৎপাদনযন্ত্রের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনযন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানা হটিয়ে বাজারের শক্তির উপর নির্ভরশীল উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত পরিকল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন এবং যুদ্ধোত্তর কালে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি অনগ্রসর অবস্থা থেকে যেভাবে দ্রুতগতিতে উন্নত অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে পেরেছে, তা সম্ভব হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিকল্পনাগুলির সফল প্রয়োগের জন্য। এই-সমস্ত সাফল্যগুলি অর্জন করার পরও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সম্প্রতি রাষ্ট্রের শিল্পগুলিতে বাজারের প্রতিযোগিতার নীতি অনুসরণ করার বিষয় শুধু আলোচিতই হচ্ছে না, বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করাও হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশে এই নীতির বিবর্তন অনেকেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। বিশেষজ্ঞদের কারো-কারো মতে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ব্যবস্থার পক্ষে এটা একরকম ব্যর্থতার স্বীকৃতি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বাজারের অর্থনীতির কোনো ভূমিকা থাকতে পারে কি না, সেই প্রশ্ন এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার দ্বারা পরিচালিত এবং বাজারভিত্তিক আর্থব্যবস্থার প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রথমটিতে দেশের সম্পদের ব্যবহার এবং উৎপাদনের সামগ্রী নির্বাচন এবং তার উৎপাদনের পরিমাণের লক্ষ্য কেন্দ্রীয় নির্দেশের দ্বারা নির্ধারিত হয়; আর দ্বিতীয়টিতে এই বিষয়গুলি নির্ধারিত হয় দেশের বিভিন্ন অংশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছোটো-বড়ো বাজারগুলিতে স্থানীয়ভাবে যোগান আর চাহিদার শক্তির সামঞ্জস্যের মাধ্যমে। ধনতান্ত্রিক দেশে প্রতিযোগিতামূলক অবাধ বাণিজ্যের নীতি শেষ পর্যন্ত বাজারের শক্তি থেকে একচেটিয়া ধনতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি করে—আমরা এখানে সেই আলোচনা করছি না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেও যে বাজারের একটি ভূমিকা থাকতে পারে, তা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অল্প সময়ের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নে আলোচনার বিষয় হয়েছিল। বিপ্লবের পর আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের সময় লেনিন সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক প্রশাসনব্যবস্থা, যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ (War Communism), প্রবর্তন করেন। বাজারে মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয়বিক্রয়-ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রচলিত হল সরাসরি পণ্যবিনিময়ব্যবস্থা। রাষ্ট্র কঠোর-ভাবে নির্দেশ জারি করত উৎপাদনের সমস্ত বিষয়ে। জরুরি অবস্থার মধ্যে এই ব্যবস্থা অনেকটা কার্যকরও হয়েছিল। কিন্তু স্থিতাবস্থা ফিরে এলে এই

ব্যবস্থা আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। বিশেষ করে কৃষকসমাজ ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে ফিরে যেতে উৎসুক ছিল। উৎপাদনব্যবস্থায় পার্টির নির্দেশ ক্রমশই অচল হয়ে পড়ছিল, এবং উৎপাদনের হার কমতেই থাকছিল। এই অবস্থায় বহু বিতর্কের পর নতুন অর্থনৈতিক-নীতি নিউ ইকনমিক পলিসি বা 'নেপ' ব্যবস্থার প্রবর্তন হল ১৯২১-এর পর। নেপ-ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র শিল্প এবং কৃষিতে সুযোগ দেওয়া হল ব্যক্তিগত উদ্যোগের; সুযোগ দেওয়া হল বাজারের শক্তিকে; যোগান আর চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হতে থাকল এইসব পণ্যের মূল্য।

নেপ-এর নীতি কিছুকাল চলার পর ধীরে-ধীরে ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রসারের মধ্য দিয়ে কৃষকদের মধ্যে ক্ষুদ্র মূলধনীর বা কুলকদের প্রভাব বাড়তে থাকল। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সুবিধাজনক মূল্যে কৃষিজাত পণ্য সংগ্রহ করা ক্রমশই দুঃসাধ্য হয়ে এল। এই অবস্থায় স্তালিনের নেতৃত্বে কুলক-বিরোধী অভিযান, যৌথ-খামার-ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বাজারের শক্তির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হল। ১৯২৯ সালকে এই দিক থেকে দিকপরিবর্তনের নির্দেশক বলা যেতে পারে।

এই সময় থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত, এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কালে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সাহায্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলি অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপুল সাফল্য অর্জন করল তা সমগ্র বিশ্বের কাছে এক উদাহরণ উপস্থিত করল।

বাস্তবিক পক্ষে, ১৯২০-র দশকে এবং পরবর্তী সময়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে যেসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল তা যে-কোনো কৃষিপ্রধান দেশের শিল্পোন্নয়নের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতবর্ষেও বর্তমান অবস্থায় যে বিষয়-গুলি বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে সে সম্পর্কে অনেক মৌলিক সিদ্ধান্ত সোভিয়েতের আলোচনার মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন, বৃহৎ আর ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে সম্পর্ক, কোনো জিনিস বিদেশ থেকে আমদানি করা বনাম স্বদেশে প্রস্তুত করার প্রশ্ন, বিদেশী শিল্পপতিদের সহযোগিতায় শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন, কৃষিতে সমবায় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রশ্ন, এবং সর্বোপরি পরি-কল্পনা আর বাজারের শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রশ্ন। অর্থাৎ একটি অনুন্নত দেশকে শিল্পোন্নত করার সময় যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার সমস্ত দিকগুলিই বিতর্কের বিষয় হয়েছিল। এই বিতর্কে যোগ দিয়ে-ছিলেন তখনকার প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ বুখারিন, প্রিব্রাঝেনস্কী, স্টুমিলিন, বাজারভ প্রভৃতি। বিশের দশকের এই বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে ত্রিশের দশক থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্র পুরোপুরি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার নীতির প্রবর্তন করল। কী অবস্থায় সম্প্রতি আবার বাজারের শক্তি, ব্যক্তিগত উদ্যোগ—এইসব প্রশ্নের নতুন করে আলোচনা হচ্ছে বুঝতে হলে সোভিয়েত অর্থনীতির কয়েকটি মৌলিক পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করা দরকার।

বিপ্লবোত্তর এবং যুদ্ধোত্তর অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত পরি-কল্পনার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশের সমস্ত সম্পদ এবং বিনিয়োগের জন্য মূলধন যখন সীমিত, তখন প্রয়োজন হয় যথেষ্ট সতর্ক হয়ে এগুলি ব্যবহার করা। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হয়, বিশেষ করে বিনিয়োগের মূলধন যখন রাষ্ট্রের হাতেই কেন্দ্রীভূত।

পুনর্গঠনের কাজে এবং পরবর্তী সময়ে দীর্ঘকাল ধরে সোভিয়েত উৎপাদনব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশবাসীর নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা দ্রুত পূরণ করা। সোভিয়েত পরিকল্পনায় এই সময়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রতিটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে কোন্ বস্তু কী পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে তা কেন্দ্রীয়-ভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত। এই পদ্ধতিতে দুষ্প্রাপ্য

কাঁচামাল কে কতটা পাবে তাও স্থির করে দেওয়া হত। উদ্দেশ্য ছিল কাঁচামালের অপব্যবহার রোধ করা এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা। শুধু তাই নয়, কী মূল্যে কোন্ দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হবে তাও মোটামুটিভাবে নির্ধারণ করা হত কেন্দ্রীয়ভাবেই। পর্যায়ক্রমে অনুসৃত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার উৎপাদন চমকপ্রদ-ভাবে বাড়াতে পেরেছিল। কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের মান সম্পর্কে বিশেষ নজর এই সময়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। তাই পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুযায়ী উৎপাদন সম্ভব হলেও তার উৎকর্ষ বজায় থাকে নি। যতক্ষণ পর্যন্ত চাহিদা আর যোগানের মধ্যে বড়ো রকম ব্যবধান ছিল, ব্যবহারকারী ক্রেতার পক্ষে পছন্দসই সামগ্রীর জন্য অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। একটা সময় পর্যন্ত এই অবস্থা সহ্য করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু উৎপাদনক্ষমতার ক্রমবৃদ্ধির ফলে এক সময়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যখন দেখা গেল দোকানে কোনো-কোনো পণ্য অবিক্রীত থেকে যাচ্ছে, বিশেষত যেসব দ্রব্যের উৎপাদনের মান নীচু।

এটা একটা নতুন পরিস্থিতি। দেখা গেল, প্রচলিত পরিকল্পনার পদ্ধতিতে দ্রব্য উৎপাদনে কোনো নির্দিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এটা বোঝা গেল যে, পরিকল্পনার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা আশু প্রয়োজন। পঞ্চাশের দশকে এই নিয়ে শুরু হল নতুন ভাবনা-চিন্তা। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক লিবারম্যান বিশ্লেষণ করলেন যে, উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষ আসলে শেষ পর্যন্ত নির্ধারণ করেন ক্রেতা—যিনি তা ব্যবহার করেন। কাজেই এ বিষয়ে যাঁরা বাজারে ক্রেতা হিসাবে হাজির হন তাঁদেরই অধিকার দেওয়া হোক। এই অধিকারের প্রয়োগ হবে বাজারে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের মধ্য দিয়ে। ক্রেতারা স্বাধীনভাবে বাজারে যোগান আর চাহিদার মধ্য দিয়ে স্থির করবেন, কোন্ কোন্ দ্রব্য বিক্রীত হবে এবং ক্রয়-বিক্রয় হবে কোন্ মূল্যে। রাষ্ট্র আর কেন্দ্রীয়ভাবে মূল্য নির্ধারণ করবেন না। প্রতিটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বাজারে প্রচলিত মূল্যের ভিত্তিতে স্থির করতে হবে, কী পরিমাণ উৎপাদন তাদের করতে হবে, যাতে প্রতিষ্ঠানের আয় আর ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষকেও বাজারে সম্ভাব্য চাহিদার হিসাব করে স্থির করতে হবে উৎপাদনের লক্ষ্য। লিবারম্যান প্রস্তাব করেন, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত মানের দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহ দেবার জন্য বিক্রয়লব্ধ অর্থে প্রতিষ্ঠানের লাভ হলে তার একটা অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। এই নীতি ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে পরীক্ষামূলক-ভাবে প্রবর্তিত হয় অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সোভিয়েত এবং অন্যান্য সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে এই নীতির প্রয়োগ ক্রমশই বাড়ছে।

বাজারের শক্তির পুনরাবির্ভাবের ফলে 'নেপ'-এর সময়ের মতো ব্যক্তিগত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলি নতুন করে সৃষ্টি হবে এবং সমাজতন্ত্রকে দুর্বল করবে—এই আশঙ্কা অনেকেই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নেপ-এর অবস্থার সঙ্গে এখনকার মৌলিক পার্থক্য এই যে, সমস্ত উৎপাদনযন্ত্র এখন রাষ্ট্রের অধীনে। নতুন করে মূলধনের মালিকানার ভিত্তিতে শ্রমিকের শোষণ এখন সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, অর্থনীতিবিদদের অনেকেরই জানা আছে, দীর্ঘকাল পূর্বে ৩০-এর দশকে চিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অসকার লাঙ্গে, যিনি যুদ্ধোত্তরকালে সমাজতান্ত্রিক পোল্যানডে পরিকল্পনার নেতৃত্বে ছিলেন, বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে-ছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বাজারের মূল্যনীতি ব্যবহার করে দেশের সম্পদ সব-থেকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা হতে পারে। ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত অর্থনীতির এই জটিল প্রশ্নে লাঙ্গের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন টেলর এবং লার্নার।

অর্থনীতিবিষয়ক সাহিত্যে এই অভিমতকে লাঙ্গে-লার্নার সূত্র বলা হয়। বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা-মূলক বাণিজ্যের ব্যবস্থায় যোগান আর চাহিদার মধ্য দিয়ে উৎপাদনব্যবস্থার যে বিন্যাস ঘটে, অর্থনৈতিক বিচারে তা সর্বোৎকৃষ্ট। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আয়ের বৈষম্য এবং অসম প্রতিযোগিতা থেকে একচেটিয়া মূলধনী শক্তির উদ্ভব হয়; ফলে বাজারে স্বাধীন প্রতিযোগিতার অবসান ঘটে। লাঙ্গের মতে, প্রতি-যোগিতামূলক অর্থনীতির সুযোগ প্রকৃতপক্ষে সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলিই গ্রহণ করতে পারে। কারণ, প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির শর্তগুলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মধ্যে পূরণ করা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারলেও কোনো অবস্থাতেই উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানা পেতে পারে না।

ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনযন্ত্রের মালিক সর্বোচ্চ লাভের আশায় স্থির করেন, পরবর্তী কালে কোন্ ধরনের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য অর্জিত লাভ থেকে মূলধন বিনিয়োগ করবেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু রাষ্ট্রই সঞ্চিত মূলধনের মালিক, তার বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত করা হয় কেন্দ্রীয়ভাবে সামাজিক স্বার্থ নজরে রেখে। লাঙ্গের ব্যাখ্যা অনুসারে, রাষ্ট্রের পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষ সামাজিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়মূল্য প্রাথমিক-ভাবে নির্ধারণ করে এগুলির উৎপাদনে নিযুক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে জানিয়ে দেবেন। শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলির দায়িত্ব থাকবে বাজারের অবস্থা অনুসারে সেই মূল্যে ন্যূনতম খরচে পণ্যের উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করা। ঘোষিত মূল্যে বিক্রীত পণ্যের ঘাটতি বা বাড়তি লক্ষ করে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সেই মূল্যের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন পর্যায়ক্রমে করতে থাকবেন, যাতে শেষ পর্যন্ত এমন একটি মূল্য স্থির করা যায় যে মূল্যে সমস্ত পণ্যই বাজারে বিক্রীত হয়ে যাবে।

এইভাবে মূল্যনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের সম্পদকে পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহার করা এবং সুষম আয়-বণ্টনের ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না, এই প্রশ্ন তোলেন ডব, বারান, সুইজি, বেতেলহাইম প্রমুখ বিশিষ্ট অর্থ-নীতিবিদরা। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল, এমন কী নিশ্চয়তা আছে যে, কেন্দ্রীয়ভাবে সামাজিক স্বার্থে বিনিয়োগের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং উৎপাদনের সময় অর্জিত আয়ের থেকে যে চাহিদা সৃষ্টি হবে, এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবেই? কেন না, এমন হতেই পারে, কেন্দ্রের নির্দেশিত সামাজিক উদ্দেশ্যে বিনিয়োগের ফলে উৎপন্ন পণ্যের যে সরবরাহ, এবং নাগরিকদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল যে চাহিদা, তার মধ্যে অসঙ্গতি থেকেই গেছে। অর্থাৎ কেন্দ্র এমন কোনো মূল্যে নাও পৌঁছাতে পারেন যাতে সমস্ত পণ্য বিক্রীত হয়ে যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে কঠোর কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার মধ্যেও যে এই সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে তা আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৫০-এর দশকে দেখেছি।

বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এ বছরের জুন মাসে। সোভিয়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিষদে স্থির হয়েছে যে, আগামী জানুয়ারি মাস থেকে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে আর্থিক দিক থেকে স্বয়ংনির্ভর হতে হবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলির পরিচালকরা স্বাধীনভাবে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করবেন, এবং প্রয়োজনীয় ব্যয়ের অতিরিক্ত আয় করতে পারলে তবেই শ্রমিক-দের আয় বাড়াতে পারবেন। উৎপাদনের জন্য বোনাস দিতে হলেও একই শর্ত, অর্থাৎ বাড়তি লাভ অর্জন করতে হবে।

সোভিয়েত অর্থনীতি এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে এক নতুন দিকে মোড় নিল। বহু বিতর্কের উপর অন্তত সাময়িকভাবে একটি উপসংহার টানা হল। যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে এই নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণভাবে সফল করা যাবে কি না, তা অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করবে। নতুন ব্যবস্থায় নতুন করে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, তা ইতিমধ্যেই আলোচিত হচ্ছে। যেমন, কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার জন্য যাঁরা তার কর্তৃত্বে আছেন তাঁদের বিশেষ দায়িত্ব থাকবে; এই অবস্থায় শ্রমিকরা লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হলে আপত্তি করতে পারেন। যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভালোভাবে কাজ করবে তাদের শ্রমিকরাও ভালো আয় করবেন। পক্ষান্তরে যেসব প্রতিষ্ঠান সমান সাফল্য অর্জন করতে পারবে না, তাদের শ্রমিকদের আয়ও একই ভাবে বাড়বে না। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে আয়ের বৈষম্য ঘটতে পারে। নতুন সমস্যাগুলির সমাধানের পথও নতুনভাবে নিশ্চয়ই খোঁজা হবে। এই নতুন ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে উৎপাদনের সঙ্গে শ্রমিকদের ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা যাতে তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের সুযোগ বৃদ্ধি পায়; তারই মধ্য দিয়ে সমস্যাগুলির সমাধান বাস্তবে সম্ভব হতে পারে।

একদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা-ব্যবস্থা, যেখানে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদনের যাবতীয় বিষয় কেন্দ্রীয় নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হয়, আর অন্যদিকে বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতি, যেখানে অবাধ বাণিজ্যের ব্যবস্থায় যে-কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাজারের শক্তির উপর নির্ভর করে স্বাধীনভাবে উৎপাদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে—আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী এই দুই পদ্ধতির মধ্যে কোনো সমন্বয় সম্ভব কি না, এ পর্যন্ত তা বিতর্কের বিষয় ছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষ কোঠায় আজ এর এক বাস্তব পরীক্ষা শুরু হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়ে অর্থনীতির ইতিহাসে একটি বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা হল।

ভ্রমণ

সুরজিৎ ঘোষ

ভালোই তো ছিল, ঘরদুয়ারের ব্যস্ততা নিয়ে, অবকাশ নিয়ে
ঘরের ভিতর আলো কমে এলে দেয়ালের রঙ বদলানো ঘিরে
আলোচনা ছিল বন্ধুর সাথে, পড়শীর সাথে বাইরে ছায়ায়
অথবা আকাশে মেঘ ভারী হয়, হয় কি হয় না, তাও সারাদিন
দেখত মিলিয়ে।

কেন যে হঠাৎ বহুদিন পরে, পথে পেয়ে গেল প্রিয় বন্ধুকে
সদ্য এসেছে পাহাড়ের-বুকে-ঝরনা-ঝাঁপানো দৃশ্য পেরিয়ে
কী যে হল তার, চুপচাপ বসে দেখল কেমন দুহাত নাড়িয়ে
চোখ বড়ো করে শোনাল বন্ধু তীব্র মাতাল ভ্রমণকাহিনী
তার চারদিকে।

সেই থেকে বসে একলা ভাবছে, তাহলে তো তার চারপাশ জুড়ে
সারাদিনই এই দামাল স্রোতের আয়োজন চলে নিজের মেজাজে
যেমন ছায়ায় তেমন আলোয়, বসে থাকবার মধ্যেও বাজে
ঘুরে বেড়ানোর গভীর পিপাসা, বাজে কি বাজে না দিনরাত্রির
ভাটিয়ালি সুরে

মাঝিমাল্লার হাঁকডাক চলে, পায়ে পায়ে কাদা, ধুলো আর পোড়া ছাই।
স্রোত কমে বাড়ে, শ্রাবনে কি ঝড়ে সমানে তাদের বৈঠা হালের
গুণপনা ছাখে, ঘরের ভিতরই ঋজু নৌকোর মতো বসে থেকে,
কথা বলে কম, ঘুমোতে যায় না, হঠাৎ কখন মাঝরাতে তার ডাক
এসে পড়ে তাই।

দাঁড়িয়ে আছি

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

ফোটা ফুলের গন্ধ মেখে দাঁড়িয়ে আছি
সামনে আমার সবুজ বাগান
পাখির গানে থাঁচা ভাঙার সুরে-সুরে
নীল আকাশে ঢেউ তুলেছি।

শ্বেত পাহাড়ে কনক রোদে মানিক জ্বলে…

আলোয় আলোয় কোন্ ঠিকানা
কোথায় যাবো? নীল কুয়াশা
ছিঁড়ে-ছিঁড়ে স্বপ্নরঙিন বীজ বুনেছি
মাটির বুকে ছলকে পড়ে ভালোবাসা।

দাঁড়িয়ে আছি তৃষ্ণাকাতর
চুপ করে কার অপেক্ষাতে
পুবের আকাশ লাল হয়েছে
রৌদ্ররেণু মুঠোয় ভরি শক্ত হাতে।

মাঠ ভেঙে মাঠ পেরিয়ে যাবো
কালপুরুষের দেশ মাড়িয়ে
বীজবপনের স্বপ্নশেষে
শস্যনেশায় দাঁড়িয়ে আছি।

দাঁড়িয়ে আছি শক্ত ছুটো হাত বাড়িয়ে
পায়ের নীচে মাটি আছে
শক্ত ঘাঁটি—পা টলে না।

পাখি

শীতল চৌধুরী

একদিন স্বপ্নের গতিপথে উড়তে-উড়তে একটা পাখি হঠাৎই অন্ধকার
হিম-হিম কুয়াশার নদীতে ডুবে গেল। ভেসে রইল শুধু স্থির
ঢেউহীন জলে তার দুটো চোখ, একটা লাল ঠোঁট।

সেই দুটো চোখ আজ লক্ষ তলোয়ার হয়ে
প্রতিদিন রাতে আমার হৃৎপিণ্ডকে পাথরের টেবিলে রেখে
অপারেশন করে;

লাল ঠোঁট লক্ষ আলপিন হয়ে
সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙে
বোধের ভেতরে রচনা করে এক জটিল জ্যামিতি।

সেই থেকে আমার আত্মার গায়ে
কোনো শৌখিন জামা নেই।

স্মৃতি

গৌতম হাজরা

পলাশ ফুরিয়ে গেলে তীব্র রোদে জ্বলে যায় মাঠ

তখন বুকের মধ্যে ভেজানো কপাট খুলে
দু চোখ জড়িয়ে নেয় দুপুরের ক্লান্ত ঘুম
সে বড়ো নিঃসঙ্গ সঙ্গিহীন
যন্ত্রণার মুখোমুখি হাতে রাখে হাত।

ঝরে গেলে গাঢ় রাত, সমস্ত ব্যাকুলতা
শালমঞ্জরীর ঘনফুল
পাণ্ডুর চাঁদের আলো ম্রিয়মাণ পড়ে থাকে
সোনাঝুরি নিমের পাতায়।

নিজ বাসভূমে তখন দীর্ঘ পরবাস
হাহাকারে স্মৃতিই কাঁপায়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : একটি সফল ও উদ্ভাবনশীল সংস্থা

জয়ন্তকুমার রায়

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে যে শিক্ষা লাভ করেছি, বর্তমান প্রবন্ধে তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত করব। "টু চেঞ্জ এ মিরাকল্: এ স্টাডি অব দ্য গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অব বাংলাদেশ"—আমার লেখা এই বইটি এখন যন্ত্রস্থ। প্রসঙ্গত, আমার লেখা আরও দুটো বইয়ের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন: ১৯৮৩-তে প্রকাশিত "অরগ্যানাইজিং ভিলেজার্স ফর সেলফ-রিলায়েন্স্: এ স্টাডি অব দীদার ইন বাংলাদেশ" এবং ১৯৮৬-তে প্রকাশিত "অরগ্যানাইজিং ভিলেজার্স ফর সেলফ-রিলায়েন্স্: এ স্টাডি অব গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র ইন বাংলাদেশ"। ছোটো সংস্থা "দীদার" এবং মাঝারি সংস্থা "গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রে"র কার্যকারিতা অনুধাবন করতে গিয়ে যে শিক্ষা লাভ হয়, সেটা বড়ো সংস্থা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পর্যালোচনায় আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। মৌলিক শিক্ষা তিনটি: এক, দরিদ্রতম গ্রামবাসীও তাঁর সুপ্ত অথচ বিপুল শক্তির ব্যবহার করে অতি অল্প দিনে—এক বৎসর বা তারও কম সময়ে—দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম। দুই, ওই সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজন সেই ধরনের অর্থসাহায্যকারী সংস্থা যা সৃজনশীল নেতৃত্ব এবং সজাগ, সংবেদী আর দায়িত্ববান সংগঠনের সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম। তিন, ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সাধারণ সরকারি সংস্থাগুলি এই ধরনের নেতৃত্ব আর সংগঠন জোগাতে ব্যর্থ হয়েছে।

৩০ এপ্রিল ১৯৮৭-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ৫৮৫৯টি গ্রামে কর্মরত, এবং গ্রামের এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। উদাহরণস্বরূপ, ৩০ সেপটেম্বর ১৯৮৬ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ৪৬২১টি গ্রামে তার কার্যকলাপ বিস্তৃত করেছিল। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কোন ঋণগ্রহীতাকেই সচরাচর ৫০০০ টাকার বেশি ধার দেয় না। পক্ষান্তরে, শহরবাসী ধনী ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সরকারি সংস্থা থেকে এক-একজনই কোটি-কোটি টাকা ঋণ নেন, এবং এঁদের মধ্যে শতকরা দশজনও টাকা ফেরত দেন না। আর

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যরা প্রায় সবাই—শতকরা ৯৮-৯৯ জনই—ঋণ সময়মতো শোধ করেন। শুধু এই একটি-মাত্র তথ্য দিয়েই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সাফল্য সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু কেউ যদি এই ধরনের পরিমাণগত মূল্যায়নে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন, তাহলে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতি অবিচার করা হবে, এবং তার গুণগত সার্থকতার অমর্যাদা করা হবে। গুণাত্মক সমীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, অত্যন্ত প্রতিকূল সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক পরিবেশে গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এই পরিবেশে নানাবিধ বৈষম্য এত ব্যাপক আর বিকট যে, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যদি দারিদ্র্য-দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে সেটা হবে প্রায় অলৌকিক ঘটনার সমতুল্য। কারণ, এই সাফল্য অর্জনের জন্য গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে অতি দুরূহ যে কর্তব্যগুলি সম্পাদন করতে হবে সেগুলি হল: যেসব গ্রামবাসী ইতিপূর্বে নিঃস্ব হয়েছেন তাঁদের সংকট-মোচন, যাঁরা নিঃস্ব হতে চলেছেন তাঁদের অধোগমন প্রতিরোধ করা, দরিদ্রদের নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা করে তাঁদের মধ্যে সেই আত্মবিশ্বাস, ঐক্যবোধ, আত্মসম্ভ্রম এবং চেতনা জাগ্রত করা যার ফলে তাঁরা ক্রমাগত জীবন-ধারণের মান উন্নয়নের সার্থক চেষ্টায় লিপ্ত থাকেন। এই কর্তব্যগুলি সঠিক নিষ্পন্ন হলে অল্প দিনেই ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে ছোটোখাটো সংঘাত দেখা দিতে পারে, এবং দূর ভবিষ্যতে এই সংঘাত বিশাল আকার ধারণ করতে পারে।

সবচেয়ে আগে—চেতনার সঞ্জীবন

আর্থিক অবস্থার উত্তরোত্তর উন্নতির পথে গ্রামবাসীদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গেলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাঁদের চেতনা সঞ্জীবিত করা। এই কাজ যেমন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অভাবনীয় রকম কঠিন। কারণ চেতনার উন্মেষ ঘটাতে ভয়কে আশায় এবং আশাকে আত্মবিশ্বাসে রূপান্তরিত করতে হবে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এই কাজে কী ধরনের সাফল্য অর্জন করেছে সেটা বুঝতে গেলে একজন গবেষককে বহু-সংখ্যক দরিদ্র গ্রামবাসীর জীবনকাহিনী সংগ্রহ করতে হবে। একজন মহিলা (নাম ধরা যাক আমিনা) গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাছে প্রথমবার ঋণ সংগ্রহ করতে গিয়ে এত ভয়বিহ্বল থাকেন যে মাত্র ৫০ টাকার বেশি ঋণ চাইতে পারেন না; গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীরা তাঁকে সাহস জুগিয়ে শেষ পর্যন্ত ২৫০ টাকা ধার নিতে রাজি করান। অপর একজন মহিলা (নাম হয়তো মরিয়ম) গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে প্রথমবার ধার নেবার সময় মাত্র ২০০ টাকা চান; গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীদের কাছে আশ্বাসলাভ করে মরিয়ম ৬০০ টাকা নিতে রাজি হন। দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য দুর্জ্ঞেয়-ভাবে একজন গ্রামবাসীর মনকে প্রভাবিত করতে পারে; এমন-কি দারিদ্র্য-দূরীকরণের সংকেতও তাঁকে শঙ্কিত করে তুলতে পারে। কমলা নামের এক মহিলা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে প্রথমে ২৫০০ টাকা ঋণ পেয়ে এত ভয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েন যে ওই ঋণ ঠিকমতো ব্যবহার করার ক্ষমতা তাঁর আছে কিনা—এ ব্যাপারে তাঁর মনে গভীর সন্দেহ দেখা দেয়। তিনি সমস্ত টাকা গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে ফেরত দিয়ে মাত্র ৫০০ টাকা ঋণ নেন। এই ভয় মোটেও অস্বাভাবিক ছিল না, কারণ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক হবার আগে কমলার স্বামীকে মহাজন কখনই একসঙ্গে ১৫০ টাকার বেশি ঋণ দিতে রাজি হয় নি, এবং ওই সামান্য ধারের জন্যেও মাসে শতকরা পাঁচটাকা হারে সুদ দিতে হত! এই ধরনের অনেক ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপি-বদ্ধ করা সহজ। সেটা না করে এই প্রসঙ্গে একটি ছোটো প্রবন্ধে যেটা জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন সেটা হল এই যে, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মতো একটি সংস্থার সংস্পর্শে এসে একজন দরিদ্র গ্রামবাসীর ব্যক্তিত্বে রূপান্তর ঘটে। দৃষ্টান্ত, জরিনা নামে এক মহিলা

প্রথমবার ৩০০ টাকার বেশি ধার নিতে সাহস পান না; কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে ওই টাকা পরিশোধ করে আবার ধার নেবার সময় ২৫০০ টাকা নিতে দ্বিধা করেন না। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীদের নিরন্তর সহযোগিতায় জরিনার সাহস আর উদ্যোগ অচিন্তনীয় মাত্রায় বৃদ্ধিলাভ করে।

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যখনই দরিদ্র গ্রামবাসীর মন থেকে ভীতি দূর করতে পারে, তখনই শুরু হয় সেই প্রক্রিয়া যাতে নানাভাবে গ্রামবাসীরা তাঁদের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মান প্রকাশ করেন, জোরদার করেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একজন ঋণগ্রহীতা যে যত শীঘ্র সম্ভব নিজস্ব একটি কুঁড়েঘর নির্মাণ করতে চান তার প্রধান একটি কারণ হল আত্মমর্যাদাবোধ। একটি ছোটো ঘরে পুত্র, পুত্রবধূ আর নাতিনাতনিদের সঙ্গে বাস করা নিঃস্ব বৃদ্ধা রহিমার কাছে চরম গ্লানিকর। তাই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ২০০০ টাকা ঋণ পাওয়ামাত্র তিনি তার একটি বৃহৎ অংশ ব্যয় করে নিজের জন্য একটি খড়ের ঘর তৈরি করান। এর ফলে কিন্তু দৈনন্দিন ব্যাবসার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন অত্যন্ত কমে যায়, এবং রহিমাকে মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে সাপ্তাহিক কিস্তি জমা দিতে হয়। প্রখর দৌস্রতাপ বা ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে ঘরে-ঘরে এবং গ্রামে-গ্রামে মনিহারি দ্রব্য বিক্রয় করা তাঁর কাছে অনায়াসসাধ্য মনে হয়, কারণ নিজের সত্যো-নির্মিত পর্ণকুটির রহিমাকে এনে দিয়েছে অনাস্বাদিত-পূর্ব মর্যাদাবোধ আর কর্মপ্রেরণা। শহর বা গ্রামের ধনী ব্যক্তিরা সরকারি ঋণ নিয়ে তা ফেরত না দিতে প্রায় সর্বদাই সচেষ্ট; কিন্তু রহিমার কাছে এই গাফিলতি অকল্পনীয়। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নিয়ে গবেষণা করতে গেলে রহিমার মতো অনেক ব্যক্তিই নজরে পড়বে। এঁদের কৃতিত্ব থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে সুযোগের চরম অভাবে দরিদ্র গ্রামবাসীদের চেতনায় সম্মানবোধ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে; কিন্তু সামান্য সম্পদ-সদ্ব্যবহারের সুযোগ এলেই ওই সম্মানবোধ সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্বল্প চেষ্টাতেই দরিদ্র গ্রামবাসীর চেতনার অন্তর্নিহিত শক্তিকে বোঝা যায় এবং সমীহ করা যায়। কিন্তু প্রথানুগ সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের পক্ষে এই চেষ্টাটুকু করাও সম্ভব নয় (যেমন প্রদত্ত ঋণের শতকরা ২৫-৫০ ভাগ নিয়মিত আদায়ও তাঁদের কাছে প্রায়শ স্বপ্নাতীত)। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মতো কর্মনিপুণ, সেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের পক্ষে এই চেষ্টা করা সহজ, স্বাভাবিক। তাই দরিদ্র গ্রামবাসী যখন নিজস্ব বাসস্থান তৈরি করে তাঁর মর্যাদাবোধ বিকশিত করার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তাঁকে যথাযথ স্বীকৃতি দেয়। অন্য ঋণের সঙ্গে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বিশেষ গৃহ-ঋণের আয়োজন করে।

এই প্রসঙ্গে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের খাতকদের চেতনায় শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বও সহজে উপলব্ধি করা সম্ভব। এঁদের অনেকেই শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য ব্যয়ে কুণ্ঠিত নন, যদিও তার ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বিপুল-ভাবে হ্রাস পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন ঋণগ্রহীতা তাঁর ভাগিনেয় যাতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে পারে সেজন্য তাঁর সমগ্র বার্ষিক সঞ্চয় ৫০০ টাকা থেকে ৪২০ টাকাই খরচা করতে পিছপাও হন না। শিক্ষার প্রতি দরিদ্র গ্রামবাসীদের এই গভীর আগ্রহ লক্ষ করে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে—এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মতো গণমুখী প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক চায় না যে তার খাতকদের সন্তানরা তাদের পিতামাতার মতোই দারিদ্র্যের জন্য শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বিশেষ ধরনের ঋণের আয়োজন করেছে, যা ব্যবহার করে ঋণ-গ্রহীতারা সন্তানসন্ততিদের হাঁস-মুরগিপালন এবং অন্যান্য যৌথ উদ্যোগে নিয়োজিত করতে পারেন। ওই উদ্যোগ থেকে যে আয় হবে তা বিদ্যালয় তহবিলে জমা হবে, এবং বিদ্যালয় নির্মাণ-পরিচালনার কাজে ব্যয় হবে।

মহিলাদের অগ্রণী ভূমিকা

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মহিলা-ঋণগ্রহীতারা যে-কোনো গবেষকের বিশেষ মনোযোগ দাবি করতে পারেন। এর কারণ যেমন এই যে মহিলারাই গ্রামের সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত গোষ্ঠী, তেমনি মহিলারা খাতক হিসাবে পুরুষ খাতকদের তুলনায় অনেক বেশি দায়িত্বশীল। যেসব মহিলা নানাভাবে সামাজিক উৎপীড়নের শিকার হয়েছেন—যেমন, যাঁর স্বামী অন্যায়ভাবে তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন, অথবা স্বামী একাধিক বিবাহ করার ফলে যাঁর বিবাহিত জীবনে ছেদ ঘটেছে—তাঁদের অনেকের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক আত্মসম্ভ্রম আর নেতৃত্ব সৃষ্টি করেছে। দৃষ্টান্ত: স্বামিপরিত্যক্তা তারা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ে তাঁর আর্থিক অবস্থার এত উন্নতি করেন যে স্বামী লোভবশত তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলন-এর প্রস্তাব দেন। কিন্তু গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সংস্রবে এসে তারার সাহস আর সচেতনতা এত প্রখর হয়েছে যে তিনি তাঁর প্রস্তিত স্বামীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় সাহানা বিবাহবন্ধন ছিন্ন করেন। এরপর সাহানা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ে আত্মনির্ভর হন। তাঁর আর্থিক অবস্থা আর ব্যক্তিত্বের দ্রুত রূপান্তর ঘটে। সাহানা সমাজসংস্কারে মনোনিবেশ করেন, বেশ কিছু যৌতুকবিহীন বিবাহের আয়োজন করেন। যৌতুকপ্রথা দরিদ্র গ্রামবাসীদের তীব্র বিপত্তির সম্মুখীন করে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কর্মীদের নিরন্তর প্রচার আর উৎসাহদানের ফলে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কিছু খাতক যৌতুকবিহীন বিবাহ মেনে নিয়েছেন। খাতকদের পরিবারে বিবাহযোগ্য ব্যক্তি-দের একটি তালিকাও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কর্মীরা তৈরি করছে। এর ফলে আগামী দিনে যৌতুকবিহীন বিবাহের আয়োজন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। তবে, অদূর ভবিষ্যতে যৌতুকপ্রথার বিলুপ্তি ঘটানো সম্ভব নয়। অতএব, এই প্রথার কু-পরিণাম যথাসম্ভব সীমিত করার উদ্যোগ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যখনই টাকা ধার দেয় তখনই প্রত্যেক ঋণীকে কিছু টাকা সমষ্টিগত তহবিলে বা গ্রুপ ফানডে জমা দিতে হয়। যৌতুকপ্রথা থেকে উদ্ভূত সংকটে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গ্রুপ ফানডের ব্যবহারে উৎসাহ দেয়। লক্ষণীয় যে এইভাবে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তার স্বভাবসিদ্ধ উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ করে, এবং একটি সমস্যার মোকাবিলায় দরিদ্র গ্রামবাসীদের ঐক্য গড়ার দিকে মনোযোগ দেয়।

সম্পদের স্বল্পতার জন্য গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সব সামাজিক সমস্যাকে—যেমন পরিবার-পরিকল্পনাকে—তার প্রধান কর্মসূচীর অঙ্গীভূত করনে পারে নি। কিন্তু মহিলা-ঋণগ্রহীতাদের ঐকান্তিক আগ্রহে, তাঁদের মধ্যে কারো-কারো নেতৃত্বের সুনিপুণ প্রয়োগে, এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কর্মীদের অনুপ্রেরণায়, অনেকগুলি মহিলা-কেন্দ্রে পরিবার-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। দৃষ্টান্ত: একটি মহিলা-কেন্দ্রে ৫০ জন সদস্যার মধ্যে ২০ জন স্থায়ী জন্ম-নিরোধব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, ২০ জন অস্থায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে, পাঁচ জন বয়স্কা মহিলার জন্মদায়িনী শক্তি অন্তর্হিত, আর বাকি পাঁচ জন সন্তোবিবাহিতা।

সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন আনার ব্যাপারে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ধীরগতিতে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যে পরিবর্তনের সূচনা করেছে তা পরিসরে হ্রস্ব হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যখন ছিল না তখন গ্রামের ধনীদের কাছে দরিদ্ররা অভাবে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হতেন, অথবা প্রথমে জমি বন্ধক বা লীজ দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভূমিহারা হতেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এই প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করেছে, এবং বিপরীত দিকে চালনা করেছে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বহু ঋণগ্রহীতা—যাঁদের অনেকেই অতীতে নিঃস্ব বা প্রায়-নিঃস্ব ছিলেন—ধনীদের কাছে লীজ বা বন্ধক দেওয়া জমি পুনরুদ্ধার করছেন, ধনীর জমি কিনছেন বা লীজ নিচ্ছেন। ধনীরা অবশ্য লীজ বা বিক্রির টাকা নানাভাবে ব্যবহার করছে—যেমন,

ব্যবসায়ে, অথবা আত্মীয়কে বিদেশে (বিশেষত পশ্চিম এশিয়ায়) অধিক রোজগারের জন্য পাঠাতে।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বেশির ভাগ ঋণগ্রহীতা ওই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার আগে দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করতেন, এবং অনাহার-অর্ধাহারজনিত কষ্ট সহ্য করতেন। কিন্তু এঁদের পরিশ্রমক্ষমতা এবং কর্মকুশলতা এত অসামান্য যে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাবার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা এইসব কষ্ট দূর করেন, এবং দ্রুত দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠতে থাকেন। কত তাড়াতাড়ি এই সাফল্য আসবে তা স্পষ্টত নির্ভর করবে প্রধানত ব্যক্তিগত শক্তির ওপর। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সের জলিল কেবল চার মাসেই এই সাফল্য অর্জন করেছে—বেশির ভাগ ঋণী এক বছরের মধ্যে সফল হন। পার্থিব অবস্থার ত্বরিত উন্নতির ফলে গ্রামবাসীদের আত্মসম্মানবোধ উদ্দীপিত হয়, এবং তা বিস্ময়করভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হবার আগে শহীদ রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ চেয়ে বিফল হয়, কারণ তার জামানত দেবার ক্ষমতা ছিল না। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক জামানত ছাড়া ঋণ দেয়, যদিও পাঁচ সদস্যের এক-একটি গোষ্ঠী বা গ্রুপকে এই আশ্বাসের ভিত্তিতে ঋণ দেওয়া হয় যে যদি কোনো সদস্য ঋণ শোধ না দেয়, তাহলে ওই গ্রুপের অপর সদস্যদের দায়িত্ব হবে বিপথগামী বা ব্যর্থ সদস্যকে বোঝানো যাতে সে ঋণ শোধ দেয়, অথবা অপর সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় থেকে ওই ঋণ শোধ দিতে হবে। নতুবা, ভবিষ্যতে ঐ ব্যর্থ সদস্যের মতো গ্রুপের অন্যান্য সদস্যরাও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আর্থিক সাহায্য এবং অন্যান্য সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণ পেতে শহীদের অসুবিধা হয় নি। ওই ঋণের সফল ব্যবহারে শহীদের আর্থিক অবস্থার এমন চমকপ্রদ উন্নতি ঘটে যে জনতা ব্যাঙ্কের কর্মীরা তাঁকে মোটারকম ঋণ নেবার আহ্বান জানান। কিন্তু অতীতে জনতা ব্যাঙ্ক দ্বারা অবমাননাকর প্রত্যাখ্যানের স্মৃতি এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে লব্ধ তীব্র মর্যাদাবোধের ফলে শহীদ অবলীলাক্রমে জনতা ব্যাঙ্কের প্রস্তাব বাতিল করেন।

যৌথ উদ্যোগে উৎসাহদান

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অবিরাম আর অসফল সংগ্রাম মানুষকে করে তোলে সদাবিষণ্ণ, বিক্ষুব্ধ আর কলহ-পরায়ণ। ফলে একই পরিবার এবং বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়। কখনও-কখনও সংঘাত হয়ে ওঠে হিংসাশ্রয়ী; মারামারি খুনোখুনি ঘটে যায়। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সহায়তায় যখন জীবনযাত্রার মানে দ্রুত উন্নতি হয়, তখন কিন্তু একটি পরিবারের অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য গড়ে ওঠে। প্রাক-গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যুগের অনাহার-অর্ধাহার জাতীয় দুঃখকষ্ট জয় করার পর এবং উত্তরোত্তর আর্থিক উন্নতির আশায় সঞ্জীবিত হবার পর, গ্রামবাসীরা পরস্পরকে সাহায্য করার ব্যাপারে সার্থক পদক্ষেপ নিতে পারে। দৃষ্টান্ত বন্যা, ঝড় বা অগ্নিকাণ্ডের মতো নিয়ন্ত্রণ বা চিন্তার অতীত কোনো দুর্ঘটনায় একজন ঋণগ্রহীতার কুটির ধ্বংস হলে গ্রুপ ফানড ব্যবহার করে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। একটি ঘটনায় ঋণগ্রহীতারা নিজেরাই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের একজন সহকর্মীর আগুনে পোড়া ঘর পুনর্নির্মাণ করে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতা শুধু আশ্রয়ই লাভ করে নি, সে উদ্‌বুদ্ধ হল অনুপম ভ্রাতৃত্ব-বোধে। আর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অপরাপর ঋণীরাও এক অনন্যপূর্ব ভাবনায় অনুপ্রাণিত হল: যে-কোনো সংকটে তারা আর কেউ একাকী নয়।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রত্যেক ঋণগ্রহীতা কোনো-না-কোনো গ্রুপের সদস্য; এক-একটি গ্রুপের সদস্য-সংখ্যা পাঁচ। কয়েকটি গ্রুপ—সাধারণত দশটির বেশি নয়—একটি কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। সচরাচর একটি কেন্দ্রের সব সদস্য একই গ্রামের অধিবাসী। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার আগে গ্রামবাসীদের দারিদ্র্য তাঁদের

মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ আর বিদ্বেষ জীইয়ে রাখত। কিন্তু এই ব্যাঙ্কের ঋণ ব্যবহারে আর্থিক অবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে একদিকে যেমন একজন সদস্যের নিজের শক্তির ওপর বিশ্বাস জন্মায়, তেমনি অপরদিকে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা গড়ে ওঠে। সেজন্য, প্রাক-গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যুগে যেসব কাজ অশ্রুতপূর্ব ছিল, সেসব কাজ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যরা মিলেমিশে করতে পারেন। উদাহরণ: কয়েকজন সদস্য একত্র হয়ে নলকূপ বসান, এবং অনেকগুলি পরিবার স্বাস্থ্যকর পানীয় জলের সরবরাহে উপকৃত হয়। আর্থিক উন্নতির সুযোগ যাতে অসাম্যের সৃষ্টি না করে, সেজন্য সদস্যরা নানাবিধ যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ঋণের সার্থক প্রয়োগে একজন উদ্যমী সদস্য সহজেই প্রাক-গ্রামীণ ব্যাঙ্ক যুগের দুঃখকষ্ট দূর করে, এবং ক্রমাগত আর্থিক উন্নতির পথে ধাবমান হয়; কিন্তু সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণ ৫০০০ টাকা। তাই একজন উদ্যমশীল সদস্য অল্পদিনের মধ্যেই দুটি ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়: মূলধন এবং প্রযুক্তি। তাকে অনেক বেশি পরিমাণ ঋণ দিয়ে—যেমন, বিদ্যুৎচালিত পাম্প বা চালকল স্থাপনের সুযোগ দিয়ে—ওই দুটি বাধা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অপসারণ করতে পারে। কিন্তু তাতে সদস্যদের মধ্যে ঘোরতর অসাম্যের সৃষ্টি হবে। সুতরাং, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক উৎসাহ দেয় যৌথ উদ্যোগ গঠনে—যাতে একটি কেন্দ্রের কয়েকটি গ্রুপ, বা একটি কেন্দ্রের সবাই, অথবা একটি গ্রামের কয়েকটি কেন্দ্র মিলে উদ্যোগে যোগ দেয়, এবং লাভবান হয়। প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দরিদ্র গ্রামবাসীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করায় যৌথ উদ্যোগ বিশেষ ফলপ্রসূ। দৃষ্টান্ত: মহিলা সদস্যরা চালকল স্থাপন করেছেন, এবং পরনির্ভরতা বর্জন করে কলের পরিচালনা আর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করছেন।

অতীতে যেসব কর্মক্ষেত্রে গ্রাম (ও শহরের) ধনীদের অপ্রতিহত আধিপত্য ছিল—যেমন নদীগামী যাত্রী-বাহী যন্ত্রচালিত যানবাহনের ক্ষেত্রে—সেসব ক্ষেত্রেও যৌথ উদ্যোগ মারফত গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ঋণী-সদস্যরা প্রবেশ করছেন। যৌথ উদ্যোগ গঠন ও পরিচালনা করতে গিয়ে অবদমিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে তা থেকে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীদের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হয়। তাই আমরা এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করি যেখানে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যরা একত্র হয়ে ধনী ভূস্বামীর ওপর চাপ দিয়ে যৌথ ভাগচাষের জন্য জমি আদায় করেছে। এটা যদি মৃদু সংঘাতের নমুনা হয়, তাহলে মনে রাখতে হবে যে কঠোরতর সংঘাতের পূর্বাভাসও মিলছে। নবলব্ধ ঐক্য আর শক্তির প্রেরণায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্যরা ধনীদের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন; আর্থিক লাভ সব সময় এই প্রতিযোগিতার প্রধান লক্ষ্য নয়; সামাজিক পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠা আসল উদ্দেশ্য। তাই, সরকারি নীলামে ক্রমাগত উঁচু দর হেঁকে ১৪০ জন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য ধনী প্রতিযোগীদের হটিয়ে মাত্র ৫½ মাসের জন্য ২০৩০০০ টাকায় একটি গ্রামীণ বাজার ইজারা নেন, যদিও তা থেকে লাভ হয় মাত্র ১৩০০০ টাকা। অতীতে ধনীরা দরিদ্রদের সঙ্গে এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন কখনই হন নি। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ৪০ জন সদস্য ৬০০০০ টাকায় এক বৎসরের জন্য জনৈক ধনী ব্যক্তির পেয়ারাবাগান ইজারা নেন; অতীতে বহু বৎসর এঁরা ওই বাগানেই দিনমজুরের কাজ করতেন। নিজেরা মৎস্যজীবী নয় এমন ধনী ব্যক্তিরা বৎসরের পর বৎসর সরকারের কাছ থেকে সস্তায় খাল ইজারা নিয়ে সেটিকে বিধিবহির্ভূতভাবে অত্যধিক দরে সত্যিকার মৎস্যচাষীদের ইজারা দিত। ওই মৎস্যচাষীরা—সংখ্যায় ২০ জন—গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সদস্য হয়ে নিজেরাই খালটি যৌথভাবে সরকারের কাছ থেকে ইজারা নেন। এই ধরনের অগণিত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, এবং এগুলি থেকে অনুমান করা যায়, যে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তার কাজের এলাকাগুলিতে দারিদ্র্য, শোষণ ও ভয়ের পাপচক্রকে বিদীর্ণ করতে পেরেছে। তা ছাড়া,

গ্রামীণ ব্যাঙ্ক জন্ম দিয়েছে সেই প্রক্রিয়ার যাতে দরিদ্রদের আর্থিক উন্নতি আর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির ফলে ছোটোখাটো ধনী-দরিদ্র সংঘাত বেধে যায়। এভাবে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অন্তত আংশিক সাফল্যের সঙ্গে এক অলৌকিক লক্ষ্যের পথে এগোচ্ছে : লক্ষ্যটি হল সামাজিক সম্পর্কের দ্রুত এবং সামগ্রিক পুনর্বিন্যাস ছাড়াই গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ। উপরন্তু, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রভাবে অপ্রচারিত কিন্তু গুণগতভাবে অসামান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে : যেমন, কোনো-কোনো এলাকায় আইন শৃঙ্খলার অভাব এবং মহিলাদের ওপর পুরুষদের নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করেছিল, কিন্তু গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মসূচী রূপায়ণের পর ওই-সব এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় এবং মহিলারা স্বাধীনতার আস্বাদ পান।

আলোচনার এই স্তরে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উঠতে পারে যে, প্রশাসক, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকদের নিয়ে গঠিত শাসকজোট—অবহেলিত জনসাধারণের প্রতি যাদের কোনো সহানুভূতি আছে, এটা মনে করার সংগত কারণ নেই—তারা কেন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম আর অগ্রগতি মেনে নিয়েছে। এই প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ জবাব হয়তো কারও পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অসম্পূর্ণ হলেও অর্থবহ উত্তর নিশ্চয়ই ভাবা যায়। শাসকজোট সংশয়গ্রস্তভাবে কিছু-কিছু সিদ্ধান্ত নেয়, এবং কোনো-কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। সংশয়ের মূলে অপরাধবোধ যতটা আছে তার চাইতে বেশি আছে সম্ভবত জনরোষ সম্পর্কে ভীতি। এক দিকে শাসকজোট দরিদ্র গ্রামবাসীদের আর্থিক উন্নতির জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে গররাজি, অপর দিকে গ্রামবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে চিরকাল প্রায়-দুর্ভিক্ষের অবস্থায় নিমজ্জিত রাখার জন্য তাদের মনে মাঝে-মাঝে সম্ভবত পাপবোধের উদয় হয়, সঙ্গে-সঙ্গে ত্রাসেরও সঞ্চার হয় যে অহিংস গণ-আন্দোলন গ্রামে শুরু হয়ে সমগ্র শাসকজোটের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিলুপ্ত করে দেবে। ফলে, কখনও-কখনও শাসকজোট অল্প খরচে সীমিত সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে কিছু-কিছু পদক্ষেপ নেয় : যেমন, সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করে, অথবা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করে। কিন্তু যে পদক্ষেপ প্রথাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল—যেমন, সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী—সেটি দরিদ্র গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়, কারণ অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রমধর্মী বিবেকবান কর্মীকে বাদ দিলে যে-কোনো সরকারি দপ্তরের কর্মীরা সাধারণ মানুষকে যা উপহার দেন তা হল গভীর অনীহা, ব্যাপক অকর্মণ্যতা, কাজে বাধা দেবার বা কাজ এড়াবার নানা কলাকৌশল, ও আর্থিক পীড়ন। রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের এইসব গলদ থেকে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নিজেকে মুক্ত রেখেছে ; গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রথাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের অংশও নয়। ফলে সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবনধারণের মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জন্য খরচাও নগণ্য। শাসকজোট ওই খরচা মেনে নিতে প্রস্তুত। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সরকার থেকে নিয়েছে মোটামুটি ২১ কোটি টাকা এবং প্রতিটি টাকা সময়মতো ফেরত দিয়েছে। পক্ষান্তরে, শাসকজোটের অন্তর্ভুক্ত (এবং সময়ে সময়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী) একটি গোষ্ঠী—ব্যবসায়ী গোষ্ঠী—রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে শত-শত কোটি টাকা ধার নিয়ে গায়েব করে দিয়েছে।

এখানে প্রশ্ন উঠবে যে, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কিভাবে এমন একটি সংস্থা গড়ে তুলল যা নিম্ন-আয়-বিশিষ্ট দেশগুলির সনাতন সরকারি আর আধা-সরকারি সংস্থাগুলি থেকে চরিত্র ও কার্যকারিতার দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক? গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কি শুধুমাত্র অতিমানবদেরই কর্মে নিয়োগ করে, এবং ওই অতিমানবদের কি কোনোদিন অধঃপতন হয় না? সরকারি সংস্থাগুলিকে তো মুষ্টিমেয় সাধারণ কর্মী খানিকটা সচল রেখেছেন, অথবা সাধারণ নাগরিককে সচলতার মায়াজালে আবদ্ধ করেছেন। সাধারণ সরকারি কর্মীরা (সংক্ষিপ্ততার খাতিরে কর্মীদের মধ্যে কর্মকর্তারাও অন্তর্ভুক্ত) যে ধরনের অনুশাসন মেনে চলায় দক্ষ সেগুলি হল : কর্তব্য এড়ানো, এবং সময়মত মামুলি কর্তব্যও পালন না করা। এজন্য, নিম্ন-আয়-বিশিষ্ট দেশগুলিতে জনমানসে প্রশাসকের এক নতুন সংজ্ঞা স্থায়ী আসন সংরক্ষণ করেছে ; প্রশাসক হলেন তিনি যাঁকে কোনো কাজের জন্যই দায়ী করা যায় না।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কেও কিছু-কিছু কর্মী দেখা যায়, যাঁরা উপরোক্ত অনুশাসনগুলির ভক্ত, কিন্তু (যেটা সরকারি সংস্থার অচিন্তনীয়) তাঁরা অচিরেই কর্মচ্যুত হন, এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে অন্যান্যরা ভরসা পান না। চাকরিচ্যুত ওই ব্যক্তিদের সংখ্যা শতকরা দুই ভাগের বেশি নয়। ফলে, সরকারি বা আধা-সরকারি সংস্থায় যেটা ব্যতিক্রম, অর্থাৎ নির্ধারিত কাজ সময়মতো করা, সেটাই গ্রামীণ ব্যাঙ্কে নিয়ম। সেজন্য, গ্রাম উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত সরকারি সংস্থাগুলিতে যে ধরনের সীমাবদ্ধতা প্রায় অনিবার্য গ্রামীণ ব্যাঙ্কে সেগুলি অনুপস্থিত। ওই সীমাবদ্ধতাগুলি হল : স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে খাপ না খাইয়ে কর্মসূচী রচনা করা ; যে জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে তাঁদেরকে কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সম্যকভাবে বোঝাতে না পারা ; কর্মসূচী রূপায়ণে প্রাথমিক ব্যবস্থা নেওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নেওয়ার ব্যাপার অবহেলা ; কর্মসূচী সম্পাদনের ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান সত্যি-সত্যি উন্নত হল কি না সেদিকে খেয়াল রাখায় ঔদাসীন্য ; কাগজপত্রে কর্মসূচীর সাফল্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য পরিমাণগতভাবে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রহসন।

শুধুমাত্র অতিমানবদের নিয়োগ করে এসব ত্রুটি বর্জন করা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পক্ষে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব নয়। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক নানাবিধ উদ্ভাবনশীল সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিয়ে উপরোক্ত গলদগুলি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখে। সাধারণ সরকারি সংস্থায় এসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা, দৈনন্দিন কাজের মাত্রা আর ধরন প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই ঐসব উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তার সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেছে। এসব পদক্ষেপে উগ্র অভিনবত্ব কিছু নেই, এগুলি হল সুবোধ্য প্রমাদের সুবোধ্য প্রতিষেধক। কিন্তু ভারত বা বাংলাদেশের মতো নিম্ন আয়ের দেশে সরকারি সংস্থাগুলি সহজবোধ্য ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে নি, বা তার চেষ্টাও করে নি। এটি একটি প্রধান কারণ যার জন্য সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার করে অল্পদিনের মধ্যে দারিদ্র্য-দূরীকরণের শক্তি সরকারি সংস্থাগুলি অর্জন করতে পারে নি। সামান্য একটি দৃষ্টান্ত থেকেই গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য সহজে অনুধাবন করা যাবে। কাজে অসততা বা অবহেলার জন্য যখনই প্রয়োজন তখনই অতি সত্বর এবং কঠোরভাবে শাস্তি প্রয়োগে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অবিচল। পক্ষান্তরে, সাধারণ সরকারি সংস্থায় কাজে অবহেলার জন্য শাস্তিদান তো প্রায় অভাবনীয় ; আর অসৎ কাজের জন্য শাস্তি এত দেরিতে দেওয়া হয় বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা এতই নগণ্য যে শাস্তি তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও দৈনন্দিন কাজের পরিচালনা এমনই যে অল্প সময়েই কর্মীদের মনে কর্তব্যনিষ্ঠা দৃঢ়মূল হয়। শৃঙ্খলা, ব্যক্তিগত অভ্যাস, সংস্থার ঐতিহ্য ও কাজ করে তৃপ্তিলাভ—এসব মিলে কর্তব্যনিষ্ঠা সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে কোনো কর্মী যদি সংস্থায় যোগদান করেই দেখে যে শৃঙ্খলা জারি নেই (যেমন, প্রায় সব সরকারি সংস্থাতেই), তাহলে অন্য তিনটি স্তরে প্রবেশ রুদ্ধ হয়ে যায়, এবং কর্তব্যনিষ্ঠা অবান্তর মনে হয়। প্রথম কয়েক মাস

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের নবনিযুক্ত কর্মীরা যে কাজের চাপ আর গতিতেও অসন্তুষ্ট বোধ করেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সংস্থার কঠোর শৃঙ্খলা তাঁদের মেনে নিতে হয় ; ধীরে-ধীরে পরিশ্রম করার, সময়মতো নির্ধারিত কাজ সমাপ্ত করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে তাঁরা সাংগঠনিক ঐতিহ্যে উদ্‌বুদ্ধ হন, এবং কর্মে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে ওঠেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের এই কর্মী (বা কর্মকর্তা) অপার তৃপ্তি লাভ করেন যখন কোনো গ্রামবাসী তাঁকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা বা কৃতজ্ঞতা জানায়। শ্রদ্ধা জানাবার কারণও স্পষ্ট : গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সহায়তায় এই গ্রামবাসী তাঁর আর্থিক অবস্থা উন্নত করতে পেরেছেন। অনাহার-অর্ধাহারেক্লিষ্ট যে গ্রামবাসী অল্প সময়ের ব্যবধানে সবল সজীব মানুষে রূপান্তরিত হন, এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মী (বা কর্মকর্তার) সঙ্গে চিন্তাশীল আলোচনা আর বিতর্কে মেতে ওঠেন, তাঁকে দেখে ওই কর্মী যে আত্মতৃপ্তি পান তার সঙ্গে সম্ভবত মূক ব্যক্তিকে ভাষাদানের আনন্দ তুলনীয়। যে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার প্রথমে আছে কঠোর শৃঙ্খলা, তারই শেষ পর্যায়ে আছে অনাবিল আত্মতৃপ্তি। সাধারণ সরকারি সংস্থায় কিন্তু এই প্রক্রিয়া শুরুই হতে পারে না, কারণ "শৃঙ্খলা" শব্দটি সেখানে উচ্চারণের যোগ্য নয়। আর শৃঙ্খলা রক্ষার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হল সব চাকরিকে নীতিগতভাবে অস্থায়ী কিন্তু বাস্তবে স্থায়ী রাখা। অর্থাৎ, কোনো চাকরিই স্থায়ী নয়। কিন্তু অকর্মণ্য এবং/অথবা অসৎ না হলে কেউই চাকরি হারাবে না।

কঠোর শৃঙ্খলার সঙ্গে-সঙ্গে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ এবং আত্মসমালোচনার স্বাধীনতাও আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে প্রশিক্ষণরত কর্মকর্তা বা কর্মীরাও বিভিন্ন শাখা দপ্তর সম্পর্কে সমালোচনামূলক প্রতিবেদন রচনা করেন, যার ফলে ত্রুটি সংশোধন বা কর্মসূচী পরিচালনায় উন্নতিবিধান সহজতর হয়। ব্যর্থতা ঢেকে রাখার কোনো প্রয়াস গ্রামীণ ব্যাঙ্কে নেই, যেমন নেই গ্রামাঞ্চলে শাখা কার্যালয়গুলির কর্মী (বা কর্মকর্তাদের) রচনাত্মক তৎপরতাকে অবদমিত করার চেষ্টা। ফলে, সামাজিক নিপীড়ন বা কুসংস্কার প্রতিরোধে কিছু-কিছু অবিজ্ঞাপিত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। কাকে কতটা ঋণ কখন দেওয়া হবে তার সঙ্গে একজন ঋণগ্রহীতা পুরুষের বহুবিবাহপ্রবণতা বা জন্মশাসনের বিরোধিতার কোনো সম্পর্ক প্রত্যক্ষভাবে বা খাতায়-কলমে প্রতিষ্ঠিত না করেও ওই সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রগতিশীল ব্যবস্থা নেওয়া যায়। উপরন্তু, কর্মকুশলতার জন্য ত্বরিত পদোন্নতির বন্দোবস্ত গ্রামীণ ব্যাঙ্কে করা হয় —যেটা সরকারি বা আধা-সরকারি সংস্থায় প্রায় অসম্ভব। বস্তুত, সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থায় দুই ধরনের গোষ্ঠীর আমলা দেখা যায়। উচ্চতর গোষ্ঠীর আমলারা (ব্যতিক্রম বাদ দিলে) দায়িত্বপালন বা দক্ষতা অর্জনের কোনো যুক্তি গ্রাহ্য প্রমাণ না দিয়েও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদোন্নতি লাভ করেন ; অপর দিকে নিম্নতর গোষ্ঠীর আমলারা (ব্যতিক্রম না ধরলে) অসাধারণ কর্তব্যপরায়ণতা দেখিয়েও অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদোন্নতি থেকেও বঞ্চিত হন। এই ধরনের গলদ থেকে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক মুক্ত।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কৃতিত্ব পর্যালোচনা করতে গিয়ে এরকম ধারণা যেন না জন্মায় যে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে কোনো সমস্যাই নেই। বাস্তবে, গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর অবিরাম তত্ত্বাবধানের ফলে কোনো সমস্যা সংকটে পরিণত হবার আগেই তার প্রতিকার খুঁজে পাওয়া যায়।

নিবারণ কেরানি ও ইহুদি মেনহুইন

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

কলকাতার হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি আন্ত্রিকক্ষতদুষ্ট যে-সব গলিঘুঁজির ভেতরে আলো-হাওয়ার মড়ক-লাগা জরাজীর্ণ বাড়িতে বেঁচেবর্তে থাকার নামে কোনোরকমে বুকের খাঁচার ভেতরে প্রাণবায়ু ধরে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টায় জেরবার হতে-হতে একসময় চাকরির মেয়াদ পার করে দিয়ে, আর কিছু করার থাকে না বলে ঘরে বসে যারা শুধু ঝিমোয়, নিবারণ তার ব্যতিক্রম নন। তবে তাঁর ঝিমোনোর ধরনটা আলাদা। তিনি নিম্নবিত্ত সংসারের আর-পাঁচটা অবসরভোগী মানুষের মতো স্মৃতিয় খোলসের ভেতরে হাতপা গুটিয়ে ঝিমোন না। পোসটকার্ড সাইজের একটা জাপানি টেপরেকর্ডারে কান রেখে ইহুদি মেনহুইনের বেহালা শুনতে-শুনতে ঝিমোন। নিবারণের স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা এ নিয়ে ঠাট্টা করে। বলে, বুড়ো বয়সের ভীমরতি। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন শুনে দুঃখ করে। বলে, রিটায়ার করার পর এমন করে টেপে কান পেতে ঝিমোলে আর বেশি দিন নয়, ওপারে যাবার ডাক এসে গেল বলে। নিবারণ কারুর কথাই গায়ে মাখেন না। তিনি স্থির জেনে গেছেন, সংসারের অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যাদের মাথাব্যথা তারা ইহুদি মেনহুইন কী বুঝবে। সুতরাং এইসব স্থূলরুচির বিষয়ী মানুষজনকে ক্ষমা-ঘেন্না করা ছাড়া আর উপায় কী। অভাব-অনটনের জ্বালায় নাজেহাল হয়ে মাঝে-মধ্যে পারুলবালা গজগজ করেন, আমাকে যমে নেয় না কেন ? নিলে তো বাঁচি। এসব আর চোখের সামনে দেখতে হত না। কী যে এক মড়াখেকো নেশায় পেয়েছে ভগবান জানে। দিনরাত চব্বিশটা ঘণ্টা ওই এক প্যানপ্যানানি শুনছে, আর এদিকে সারা গুষ্টির পিণ্ডি গেলাতে গিয়ে আমার দম বেরিয়ে যাচ্ছে।

নিবারণ মনে-মনে হাসেন। মেয়েছেলের বুদ্ধি আর এর চেয়ে বেশি কী হবে। ইহুদি মেনহুইন একঘেয়ে লাগবে কেন ? বার-বার আকাশ দেখে কি ক্লান্তি লাগে ?

এখন কথা হচ্ছে, চল্লিশটা বছর ধরে অফিস

বাজার দোকান করে, ডাকতারখানায় ছুটোছুটি করে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে মাথা ঘামিয়ে যে মানুষটা দম ফেলার ফুরসত পায় নি, তাঁর সঙ্গে ইহুদি মেনহুইনের জান-পহচান হল কী করে? সে আরেক ইতিহাস।

সাধ্যে না কুলোলেও মনের ভেতরে সঙ্গোপনে কোনো-না-কোনো শখ পুষে রাখার বাতিক অনেক ছাপোষা মানুষজনেরই থাকে। নিবারণেরও ছিল ছোট্ট একটা টেপ কেনার শখ। তিনি ভালো করেই জানতেন, অভাবী সংসারের খাঁই মেটাতে গিয়ে মনের শখ মনের ভেতরেই গুমরে মরবে, কোনো দিন আলোর মুখ দেখবে না। কিন্তু ভাগ্যে থাকলে কী না হয়! রিটায়ার করার কিছুদিন আগে সহকর্মীরা যখন সরাসরি নিবারণের কাছ থেকে বরাদ্দ টাকার মধ্যে তাঁর পছন্দের কথা জানতে চাইলেন, তখন তিনি কিছুটা দ্বিধা আর সংকোচ নিয়ে তাঁর অভিরুচির কথা জানালেন। ফলে বিদায় নেবার দিন ফুলের মালা, মানপত্র, মিষ্টির প্যাকেটের সঙ্গে একটা ইহুদি মেনহুইনের নব্বই মিনিটের ক্যাসেট ভরতি টেপরেকর্ডারও নিবারণের হাতে এসে গেল। ডেসপ্যাচ সেকশানের যে ছোকরা টেপরেকর্ডার কেনার উদ্যোগ নিয়েছিল, সেই সুজিত হালদার খুদে ম্যাগাজিনে কবিতা লেখে, ঘাড় পর্যন্ত বড়ো-বড়ো চুল রাখে, ফ্রেনচকাট দাড়ি রাখে। চলতি জনরুচির বিরুদ্ধে সব সময়ই মারমুখী। তাই সে নিবারণের মতো হাড়ে-মজ্জায় পাকাপোক্ত অবসরভোগী কেরানিকে ভক্তিরসের গেঁজে-ওঠা ফেনায় ভরপুর কোনো শ্যামাসঙ্গীত বা কীর্তনের ক্যাসেটের বদলে ধর্মতলা থেকে খুঁজে-পেতে ইহুদি মেনহুইন কিনে নিয়ে আসে। টেপ চালু করে শোনানোর পর সহকর্মীরা সবাই একবাক্যে তারিফ করেছে, 'বাঃ বাঃ, চমৎকার!' কেউ ওজর-আপত্তি তোলার সাহস পায় নি, পাছে দুর্মুখ সুজিত ফোঁস করে ওঠে। তবে আড়ালে-আবডালে ছোকরা কবির মুণ্ডুপাত করতে ছাড়ে নি কেউ। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছে, 'যেমন কবি, তার তেমনি উদ্ভট খেয়াল! যাঁর জন্যে আনা, সেই নিবারণ কি কোনো দিন বাপের জন্মে ইহুদি মেনহুইনের নাম শুনেছেন?'

না, শোনেন নি। শোনার কথা নয়। চল্লিশটা বছর ধরে সংসারের ফুটো নৌকোর জল ছেঁচতে-ছেঁচতে যাঁর কালঘাম ছুটে গেছে, সেই নিবারণ কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি, কদর্য সংসারের লেনাদেনা-হিসাব-নিকাশের বাইরে বেহালার ছড়-টানা এমন আশ্চর্য সুন্দর একটা সুরের জগৎ আছে। তিনি ভেবেছেন, বিদায়ী উপহার হিসাবে টেপটা হাতে এলে, শ্যামবাজার থেকে রবীন্দ্র-নজরুল-আধুনিক কি পল্লীগীতি, যাই হোক—এমন খানকতক সস্তাদরের ক্যাসেট কিনে আনবেন। আজকাল তো নামি-দামি শিল্পীর নামে নকল ক্যাসেটের বাজার রমরম করে চলছে। ধর্মতলার ফুটপাথে বিছানো কাপড়ের ওপর ক্যাসেটের কাঁড়ি সাজিয়ে দোকানি হাঁকে, 'লে লে বাবু দশ রুপাইয়া।' নকল কি আসল—তা নিয়ে নিবারণের মোটেই মাথাব্যথা ছিল না। তিনি চেয়েছেন, মেছোহাটা সংসারের হল্লা থেকে কান বাঁচিয়ে অবসর-জীবনের খানিকটা সময় কাটিয়ে দেবেন নিজের পছন্দসই কিছু ক্যাসেটের গান শুনে। কিন্তু ইহুদি মেনহুইনের স্বাদ পাবার পর আর কোনো কিছুই তাঁর মনে ধরে না। আফসোসে বুকের ভেতরটা খামচে ধরেন তিনি, কী ভুলই না করেছেন, চল্লিশটা বছর বৃথা কাটিয়ে দিলেন। ইহুদি মেনহুইনের সুরের জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে শুধু গর্দভের মতো সংসারের বোঝাই টেনে গেলেন। আফশোস যত বাড়ে, তত তাঁর রোখ চাপে। স্থির করেন, জীবনের বাকি কটা বছর মনের সাধ মিটিয়ে ইহুদি মেনহুইন শুনবেন। ফলে জাপানি টেপটা নিবারণের নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। খাওয়া-শোওয়া-বসা, যখন যেখানে হোক, সেটা তাঁর কানের কাছে থাকা চাই। কিন্তু সব সময় তো সুরের জগৎ নিয়ে পড়ে থাকা চলে না। খিদে পায়, ঘুম পায়, সকালে বাজার আর সন্ধেয় ছাত্র-

পড়ানো আছে।

রিটায়ার করার আগে সংসারের কাজেকর্মে উৎসাহ না থাক, কোনো অবহেলা ছিল না নিবারণের। কিন্তু এখন তিনি উশখুশ করেন, কতক্ষণে কাজকর্মের দায় থেকে মুক্ত হয়ে কানের কাছে টেপটা নিয়ে বসতে পারেন। তাই বাজারে গিয়ে দরদস্তুর কি বাছাবাছির ধার দিয়েই যান না। তাড়াহুড়ো করে যা-হোক কিছু থলের ভেতরে পুরে কাঁকলাসের মতো শরীরটা নিয়ে প্রায় ছুটতে-ছুটতে বাড়ি ফেরেন। তারপর গা থেকে ঘামে ভেজা হ্যানডলুমের পানজাবিটা ছাড়িয়ে নিয়ে ইহুদি মেনহুইনের খোলসের ভেতরে ঢুকে পড়েন। পারুলবালা থলে থেকে আনাজপত্তর বার করতে গিয়ে রোজই বিড়বিড় করেন। একদিন রাগে ফেটে পড়লেন, 'দিনরাত্তির চব্বিশটা ঘণ্টা ঐ মড়াখেকো যন্তর নিয়ে পড়ে থাকলে কেউ ভেবেচিন্তে বাজার করতে পারে? কী বেগুন এনেছ দেখো, পোকায় ভরতি। কচি দেখে ঢেঁড়স আনতে বলেছিলাম, আর এই তার নমুনা! উমা, তোর বাপকে বলে দিস, কাল থেকে আর বাজারে যেতে হবে না, পিণ্টু যাবে।'

নিবারণের মুখে রা নেই। তক্তপোশে আধ-শোওয়া অবস্থায় টেপটা আরও কানের কাছে নিয়ে হাঁপ ছাড়লেন। যাক, বাঁচা গেল। কাল থেকে ছুটি। বাজারে ভিড়ের চাপে আর হল্লায় অতিষ্ঠ হওয়ার সময়টা টেপে কান পেতে দিব্যি কেটে যাবে। কিছু-দিন বাদে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে ছাত্রবাড়িতে গিয়ে অভিযোগ শুনলেন। আগে তো মাস্টারমশাই এমন ছিলেন না, বেশ যত্ন নিয়ে পড়াতেন। কিন্তু ইদানীং কেমন যেন গা-আলগা ভাব—নমো-নমো করে পড়া-শোনার কাজ সেরে দেন। এমন করে চলে কী করে? নিবারণ কাজে ইস্তফা দেওয়ার জন্যে এক-পা বাড়িয়েই ছিলেন। তাই অভিযোগ শোনা মাত্র মনের অভিলাষ খোলসা করে দিলেন। তারপর দায়মুক্ত হওয়ার খোশমেজাজ নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসে যথা-রীতি ইহুদি মেনহুইনের খোলসের ভেতরে সেঁধিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

চাকরি করার সময় অভাবী সংসারের খাঁই মেটানোর ধান্দায় যখন বাজারে গিয়ে নিবারণ সবজিওলা কি মাছওলার সঙ্গে ইতরের মতো দর কষা-কষির ফাঁকে দলা-পাকানো ভুরুর ভাঁজে ভাবনা বুনতেন—পোড়া পেটের গর্ত বোজাই করার জন্যে অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা মাথা খাটিয়ে বার করা যায় কিনা—তখন তাঁর খবরের কাগজ পড়ার অভ্যেস ছিল। এখন সে অভ্যেসে মরচে ধরে গেছে। কখনো-সখনো পুরনো অভ্যেসের জের টেনে মোটাদাগের খবরগুলোর ওপর চোখ বোলালেও মনোযোগ দেন না, নিতান্ত অবহেলায় কাগজ ভাঁজ করে রেখে দেন। আগে আত্মীয়বন্ধু কি পড়শিদের সঙ্গে দেখা হলে কত তত্ত্বতল্লাশ নিতেন, কিন্তু এখন 'কী কেমন'-জাতীয় দু-একটা শব্দের মধ্যে আলাপের সীমা বেঁধে দেন। নিবারণের এহেন পরিবর্তন অনেকের চোখেই ধরা পড়ে। কেউ-কেউ খোঁচা দিতে ছাড়ে না। বলে, 'ব্যাপার কী হে, একেবারে যে মৌনীবাবা হয়ে গেলে।'

নিবারণ মুখ খোলেন না। যেন সব জানা হয়ে গেছে, বোঝা হয়ে গেছে—এমনি ধরনের পোড়খাওয়া তেঁতো হাসি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে রাখেন। আসলে জগৎ-সংসারের হালচাল দেখে-দেখে তাঁর চোখ পচে গেছে, ঘেন্না ধরে গেছে। তিনি সার জিনিস বুঝে গেছেন—শুধুমুহু কথা খরচ করে লাভ নেই।

নিবারণের এখন অফুরন্ত অবসর। বাজারে যাওয়া নেই, ছেলে-পড়ানো নেই। তিনি চুপচাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরে বসে ইহুদি মেনহুইন শোনেন। শুনতে-শুনতে ঝিমোন। ঝিমোতে-ঝিমোতে আধো-ঘুম আধো-চেতনার ভেতরে ছেলেবেলায় ফিরে যান—তখনই তাঁর মনে পড়ে যায় পদ্মাপারে দেশের বাড়ির জোড়াদিঘির গভীর থেকে ডুব-সাঁতার কেটে ভেসে-ওঠার সময় চোখের সামনে রোদের ঝলক-লাগা জলের ভেতরে দুলে উঠত কত অচেনা রঙের ঢেউ। আবার কখনো মনে পড়ে দেশের বাড়িতে উঠোনের সামনে

কারকার সাথে যেন মাথা-ঘোরা খেলার নেশায় ঘুরতে-ঘুরতে একসময় বেদম হয়ে শুয়ে পড়তেন আকাশের দিকে মুখ করে, তখন চারপাশে ঘুরন্ত গাছগাছালির শাখাপ্রশাখা আর পাতার ফাঁকে টুকরো-টুকরো রোদ মেঘ-আকাশ লাটিমের মতো পাক খেতে-খেতে বুক ধড়ফড় শ্বাসে-শ্বাসে জড়িয়ে যেত।

ক্রমে ইহুদি মেনহুইনে এমন নেশা ধরে গেল যে বাইরে বেরুনো প্রায় ছেড়ে দিলেন নিবারণ। শুধু মাসের পয়লা হপ্তায় একবার পোসট আপিসে যান পেনসনের টাকা আনতে। বাড়ির ভেতরেও চলার গণ্ডি সীমাবদ্ধ হয়ে আসে। দায়ে পড়ে স্নানঘরখানা খাওয়া-শোওয়ার জন্যে যেটুকু না করলে নয়, সেটুকু বজায় রাখতে হয়। কারণ এখনও তো তিনি পঙ্গু বা অথর্ব হয়ে পড়েন নি। তবে খাওয়া কমেছে, ঘুম কমেছে। ফলে শীর্ণ শরীর আরও শীর্ণ হচ্ছে দিনকে দিন। তা বলে রসবোধ নয়। টেপ শুনতে-শুনতে কখনো যদি হাতের আঙুল হাড়গিলের মতো কণ্ঠার হাড়ে উঠে আসে, নিবারণ মনে-মনে বলেন, এই হাড়-ডিগডিগে শরীরে সুরের প্রতি ব্যাকুল তৃষ্ণা যেমন লেলিহান হয়ে জ্বলে, তেমনি আবার মরণকালে ঘাট-খরচাও অনেক কমিয়ে দেয়। শুকনো খড়ের মতো এই তো শরীর। পুড়ে ছাই হতে কতক্ষণ! পারুল-বালার কিন্তু একতিল রসবোধনেই। হেঁশেল সামলাতে গিয়ে তিনি বাতের ব্যথায় কাতরাতে-কাতরাতে সারা বাড়ি মাথায় করেন, কী ভূত যে ঘাড়ে চেপেছে, ভগবান জানে। দিন নেই, রাত নেই, ওই অলক্ষুনে যন্তরটা নিয়ে পড়ে আছে। চিরটাকাল আমাকে জ্বালিয়ে খেয়েছে। আর এই শেষ বয়েসে হাড়শুদ্ধু চিবিয়ে না খাওয়া পর্যন্ত ওর শান্তি নেই। সবার বড়ো উমার মুখচোখ থমথম করে। ওর বুকের ভেতরে কোথায় যেন তার খাপছাড়া অবুঝ বাপটার জন্যে একটা শিরা চিনচিন করে ওঠে। দু-এক দিন সন্ধের মুখে নিবারণ যখন তক্তপোশে ঘাড়কুঁজো হয়ে বসে হাড়িকাঠে প্রায় মাথা গলানোর মতো ভাঁজ-করা দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে টেপ শুনতে ব্যস্ত তখন বড়ো মেয়ে উমা চা দিতে এসে নরম গলায় বলেছে, 'বাবা, টেপটা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে থেকে একটু ঘুরে এসো না। তোমার চেহারার কী হাল হয়েছে দেখেছো? পাল ডাকতারকে একবার খবর দি, ভালো করে দেখুক।'

নিবারণ খ্যাক করে উঠেছেন, 'যা তো, মেলা বকিস না। শরীর আমার ঠিক আছে। অসুখ-বিসুখ কিচ্ছু নেই।'

উমা মুখ কালো করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। তারপর থেকে আর কিছু বলার সাহস পায় নি। কদাচিৎ সমবয়সী আত্মীয়-বন্ধু কেউ বাড়িতে এলে সেই একই কথা বলে, 'এই বয়সে এমন জবুথবু হয়ে ঘরে বসে থেকো না। একটু ঘুরেফিরে বেড়াও।'

নিবারণ নীরব ভ্রূকুটি হেনে এমন করে তাকান, যেন ভাবখানা এই আমাকে নিয়ে কেন, নিজের চরকায় তেল দাও না। সে বেচারা তখন পালাবার পথ পায় না। নিবারণ মনে-মনে হাসেন। অজ্ঞ মূর্খদের তিনি কী করে বোঝান যে হাত-পা চালনা করা ছাড়াও চলা যায়। সে বাইরের নয়, ভেতরের। ইহুদি মেন-হুইনের সুরে অবিরাম রক্তস্রোতের ভেতর দিয়ে চলা। প্রতি নিঃশ্বাসের উত্থানপতনের ভেতর দিয়ে চলা।

কিন্তু কখনো-কখনো বাইরের জগতের দৃশ্য-শব্দ-গন্ধের আঘাতে নিবারণের নেশা ছুটে গেলে রোদ-ঝলকানো বুদবুদের মতো ইহুদি মেনহুইন কোথায় মিলিয়ে যায়। যে ঘরে ছারপোকা মারার দাগধরা তক্তপোশে নড়েচড়ে বসলে আঙুল মটকানোর মতো শব্দ হয়, সে তক্তপোশে শুয়ে বসে নিবারণের চোখে পড়ে ঘুপচিমতন রান্নাঘরের দরজার সামনে স্থবির সকালের ছানিপড়া আলোয় রক্তশূন্য সাদা হাত পারুলবালার। যে জানালার সামনে দাঁড়ালে দৃষ্টি আড়াল করে রাখে ওপাশের বাড়ির চুণবালি-খোবলানো কুষ্ঠক্ষতের মতো দেয়াল, যে জানালার কাছে চিত হয়ে না শুলে আঁকাবাঁকা কারনিশের ছাঁদে ঢালাই ফালি আকাশ নজরে আসে না, সে

জানালার দিকে তাকিয়ে জীর্ণ হতে-হতে কোনো-না-কোনো সন্ধেবেলায় ঝাঁকবাঁধা পাখির বাড়ি ফেরার ডাক নিবারণকে আনমনা করে দেয়। মদো-মাতাল স্বামীর ঘর করতে না পেরে যে উমা বাপের বাড়িতে চলে এসেছে মাস তিনেক আগে, তাঁর পাঁচ বছরের মেয়ে টুম্পার গলা-ফাটানো চিৎকার মাঝেমধ্যে নিবারণের মাথার ভেতরটাকে টুকরো-টুকরো করে ছেঁড়ে। ছোটো মেয়ে সুধা যখন সেলাইকলে পা চালিয়ে মহাজনের ফরমাশমতো ফ্রক, সায়া, ব্লাউজ পেশাদারি এলেমের সঙ্গে একটার পর একটা বানাতে থাকে, তখন ঘড়ঘড় শব্দে নিবারণের মাথা ধরে গেলে সিনেমার রিলের মতো কলের চাকা-ঘোরার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চোখের সামনে সুধার ভবিষ্যৎ ফুটে ওঠে। নিবারণ দেখতে পান, অভাবের আঁচড়-কামড় থেকে যেটুকু রূপ-যৌবন বাঁচিয়ে রেখে আইবুড়ো মেয়েটা কথা বলে, হাসে, গান গায় সেই সুধা কলের চাকার ঘষায়-ঘষায় কত বুড়িয়ে যাচ্ছে। শিরদাঁড়া বেঁকে যাচ্ছে, চামড়ায় দলা পাকাচ্ছে, চোখের কোলে ভাঙাচোরা রেখায় কালি জমছে। ফি বেস্পতিবার সন্ধের মুখে দেড়শ বছরের থুড়থুড়ে বাড়িটার অন্ধকূপ-এর মতো ঘরে, লক্ষ্মীর আসনের সামনে স্যাঁতস্যাঁতে ছায়া কাঁপিয়ে উমা কিংবা সুধার হাতে যখন শাঁখ বেজে ওঠে, তখন নিবারণের চোখের সামনে কখনও-কখনও পশ্চিমের দেয়ালে মৃত মায়ের কবেকার ছাতলাপড়া ফটো থেকে ধূসর বিবর্ণ অতীত উঠে আসে, সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় পদ্মাপারে গ্রামের বাড়িতে গোবরনিকনো উঠোনোর একধারে তুলসীমঞ্চের সামনে গলায় আঁচল ঘোমটা-পরা রাঙা মায়ের হাতে শাঁখ বেজে ওঠার আওয়াজে চারপাশের সবুজে-নীলে একাকার সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হওয়ার রোমাঞ্চ রোমকূপে-রোমকূপে কেমন করে ছড়িয়ে যেত।

ফুটবল কিংবা ক্রিকেট খেলা নিয়ে পিনটু মিনটু যখন তক্কাতক্কির তুফান ছোটায়, তখন নিবারণ প্রায়ই তাঁর হাড্ডিসার বুকের ওপর বারেকের জন্যে কড়াপড়া শক্ত হাত বুলিয়ে লম্বা শ্বাস ফেলেন। পিনটু বড়ো। বি. কম. পাশ। সবার ছোটো মিনটুর লেখাপড়া বেশি এগোয় নি। মাধ্যমিকটা কোনোরকমে উতরেছে। দুজনেই ট্যুইশানি করে, টাইপ শেখে, চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘোরে। এখনও এদের রক্তের তেজ আছে। স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে বেকারত্ব ঘোচানোর নিষ্ফল পরিণতি দেখতে-দেখতে এদের পিঠ যখন ক্লান্তিতে অবসাদে নুয়ে পড়বে, তখন এরা কী নিয়ে বাঁচবে—সেই অনাগত সময়ের ভাবনা নিবারণের দুই ভুরুর মাঝ-খানের গভীর খাঁজে চিত্রিত হয়।

এইভাবে ইহুদি মেনহুইনে কান পেতে ছার-পোকার কামড় খেতে-খেতে, তক্তপোশের নীচে সংসারের অকেজো বাতিল টুকিটাকি জিনিসপত্রের ফাঁকফোকর দিয়ে ছুটন্ত ছুঁচোর কিচকিচ শুনতে-শুনতে, বারান্দার তারে উমা-সুধা-পারুলবালার ভেজা শাড়ির গন্ধ পেতে-পেতে, অন্ধকারে আরশোলা ওড়ার ফড়ফড় শব্দ শুনতে-শুনতে, রান্নাবান্নার পাঁচমিশেলি গন্ধ পেতে-পেতে, জলকল নিয়ে পাঁচ ভাড়াটের হইহই কোন্দল শুনতে-শুনতে, মিনটু পিনটু উমা সুধা পারুলবালার কথাকাটাকাটি, মান-অভিমান, হাসি-ঠাট্টা, অশ্রুপাত ইত্যাদি নানা শব্দের কোরাস শুনতে-শুনতে নিবারণের দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়।

তারপর একদিন সবাই যা আশঙ্কা করেছিল, তাই ঘটল। দিনটা ছিল পৌষসংক্রান্তির। খেতে-খেতে বেলা প্রায় আড়াইটে হয়ে গিয়েছিল। নিবারণ রোজকার অভ্যেসমতন দেশলাইকাঠি দিয়ে গুটিকয় অবশিষ্ট নড়বড়ে দাঁত খোঁটা শেষ করে কানের কাছে টেপ নিয়ে গায়ে মাথায় কম্বল মুড়ি দিয়ে তক্তপোশে শুয়েছেন। সুধা পাশের ঘরে সেলাই-মেশিন চালাচ্ছে। রান্নাঘরে রেশনের আতপ চাল বেটে পারুলবালা উমা পিঠেপুলি বানাতে ব্যস্ত। টুম্পা ওপরতলার ভাড়াটে-

দের ঘরে ওর বয়সী রুমার সঙ্গে খেলছে। পিনট্ মিনট্ পাশের বাড়িতে টি-ভির পরদায় ফুটবল খেলা দেখছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়ার মুখে নিবারণকে চা দিতে এসে বার-বার ডেকে সাড়া না পেয়ে কম্বল সরিয়ে ধাক্কা দিতে গিয়ে উমার বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। নিবারণের ঈষৎ ঠাণ্ডা অনড় শরীর, আধখোলা মুখ, নির্নিমেষ চোখের স্থির তারার দিকে তাকিয়ে উমার দু-চোখ অন্ধকার করে ঘরের ভেতরের জিনিসপত্র ওর মাথার ভেতরে পাক খেতে থাকলে, ও আলমারির মাথায় কোনোরকমে হাতের ভর রেখে দাঁড়ায়। তারপর নিবারণের হার্ডিডসার বুকে কান পেতে এখনও ফল্গুর মতো প্রাণ তিরতির করে বইছে কিনা পরখ করার রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় কয়েক মুহূর্ত থরথর করে কেঁপে উঠে, পরক্ষণেই আশাভঙ্গের হতাশায় হু-হু কান্নায় ভেঙে পড়তে গিয়ে বিস্ফারিত চোখে লক্ষ করে, রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে রেডিও থেকে যেমন করুণ সুরে বেহালা বাজে, নিবারণের কানের কাছে টেপটাও সেরকম বেজে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ

কাজী আব্দুল ওদুদ

মনীষা ভিন্ন আরো নানা ধরনের সম্পদ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলোয় রয়েছে, যেমন, প্রকৃতি-প্রেম, ভগবৎ-প্রেম, স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম, মহতের পূজা, কৌতুক-হাস্য, শ্লেষ ইত্যাদি। এসবের কিছু-কিছু পরিচয় এই সংগ্রহেও পাওয়া যাবে। তবু ধর্ম রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষার মতো গুরু বিষয়ের প্রবন্ধে মনীষাই যে সবচাইতে কাঙ্ক্ষিত সম্পদ সে-সম্বন্ধে দ্বিমত না হবারই কথা। একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের বক্তব্য হয়তো আর-একটু পরিষ্কার হবে। ধর্মজীবনে ভক্তি খুব বড়ো ব্যাপার; কারো-কারো মতে ভক্তি-তন্ময়তাই ধর্ম-জীবনের সবচাইতে বড়ো লক্ষণ। ভক্তি ও ভক্তি-সাধন সম্পর্কে অনেক রচনা কবির "ধর্ম", "শান্তিনিকেতন", এসব গ্রন্থে রয়েছে। কিন্তু সেসব থেকে আমরা খুব কম অংশই গ্রহণ করতে পেরেছি। সেই বিভাগ থেকে "ভাবুকতা ও পবিত্রতা"র মতো লেখা অবশ্য আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করেছি, তার কারণ, তাতে কবি যেমন সচেতন ভক্তির অসাধারণ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তেমনি তার আনুষঙ্গিক দুর্বলতা সম্বন্ধেও। গদ্য বিচারের ভাষা। অন্যান্য সম্পদে ভূষিত হতে গদ্যের আপত্তি নেই, বরং আগ্রহ আছে; কিন্তু বিচার গদ্যের প্রাণ। সেই গদ্যই মূল্যবান তীক্ষ্ণ বিচারবোধ যার স্নায়ু ও মজ্জা-স্বরূপ। তা ছাড়া সাহিত্যের লক্ষ্য কোনো বিশেষ পাঠক-গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নয়, সাহিত্যের লক্ষ্য সাধারণ মানব-সমাজ—কিছু কৌতূহল, কিছু কাণ্ডজ্ঞান আর কিছু শুভবুদ্ধি যাদের নিত্যসম্পদ জ্ঞান করা হয়। মানুষের কোনো একঝোঁকা পরিণতি নয়, তার সমগ্র চেতনাকে ঔদাসীন্য ও অবসাদ থেকে জাগিয়ে তোলা সাহিত্যের চিরদিনের বড়ো কাজ।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মনীষার মূলে তাঁর ধর্মবোধ, অন্তত, ধর্মবোধের সঙ্গে তাঁর মনীষা অতি নিবিড়ভাবে যুক্ত। তাই তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের প্রথমেই চাইতে হয় তাঁর ধর্মবোধের পানে। তাঁর পিতার ধর্মবোধ ও ধর্ম-সাধনা তাঁর উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, একথা আমরা জানি ও মানি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর-

বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ থেকে পুনরমুদ্রিত

একটি ব্যাপারও তুল্যমূল্যকৃতির দাবি রাখে, সেটি হচ্ছে—বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর অপূর্ব সচেতনতা। কবি তাঁর "জীবনস্মৃতি"তে তাঁর বালককালের যে ছবি এঁকেছেন তাতে দেখা যায় প্রতিদিনের সূর্যোদয় বালক-বয়সে তাঁর জন্য কী অসীম-রহস্য-ভরা ছিল; আর শান্তিনিকেতনের বর্ষীয়ান আশ্রমিকদের মুখে শোনা যায় সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে উঠে তাঁরা দেখতেন কবি নীরবে পুবের দিকে মুখ করে বসে আছেন সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়। তাঁর প্রায় বিশ বৎসর বয়সে এই সূর্যোদয় একদিন তাঁর সমস্ত চেতনায় কী অমৃতময় অনুভূতির সঞ্চার করেছিল তার পরিচয় রয়েছে এই সংগ্রহের 'মানব-সত্য' প্রবন্ধে। ঋতুপর্যায় মেঘবৃষ্টি বহতা নদী—এসব সারাজীবন তাঁর অন্তরে অন্তহীন সুর জাগিয়েছে। আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি—যা কিছু প্রতিভাত হচ্ছে সব অমৃত আনন্দরূপ, উপনিষদের এই বাণী তাঁর কণ্ঠে বার-বার ধ্বনিত হয়েছে; কিন্তু তাঁর জীবনের দিকে চাইলে বোঝা যায় বিশ্বপ্রকৃতির এই অমৃতময় আনন্দরূপের উপলব্ধি শুধু যে উপনিষদ থেকে তাঁর লাভ হয়েছিল তা নয়—এই চেতনা ছিল তাঁর সহজাত মহাসম্পদ।

এর সঙ্গে আরো স্মরণ করবার আছে তাঁর পরিবেশের প্রভাব—সেই পরিবেশ বলতে বুঝতে হবে যে বিশেষ পরিবারে ও সমাজে আর যে বিশেষ দেশে ও কালে তিনি জন্মেছিলেন সেই সবই। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম-ধর্ম ও সমাজের দ্বিতীয় প্রবর্তক। উপনিষদের চিন্তা তাঁর জীবনে গভীরভাবে সক্রিয় হয়েছিল সত্য, কিন্তু সেই উপনিষদের সব কিছু তিনি গ্রহণ করেন নি। আর উপনিষদের ব্রহ্মের ধারণার সঙ্গে তাঁর জীবনে তুল্যভাবে সক্রিয় হয়েছিল তাঁর কালের নবমানবিকতার লোকহিত-সাধনমন্ত্র। এই দুইই হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরও গভীর আত্মিক সম্পদ। এই লোকহিত-সাধনের বিশেষ অর্থ অবশ্য দাঁড়িয়েছিল স্বদেশ ও স্বজাতির হিতসাধন। শুধু মহর্ষির ভিতরে নয়, তাঁর পরিজনদের মধ্যেও এই স্বদেশ ও স্বজাতিচেতনা প্রবল ছিল। কিন্তু অচিরে এই চেতনা প্রবলতর রূপ নিয়ে দেখা দেয় বৃহত্তর বাংলাদেশে ও বাংলা সাহিত্যে। সেই প্রবলতর স্বদেশ ও স্বজাতিচেতনায় রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ দেখা যায় শুধু তাঁর যৌবনে নয়, তাঁর পরিণত যৌবনে আধ্যাত্মিক চেতনা যখন তাঁর ভিতরে প্রবল হল সেই কালেও। এমন-কি তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা যেন বিশেষ মহিমা সঞ্চার করে তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতি-চেতনায়—তার পরিচয় রয়েছে ভারতের বৌদ্ধযুগের ও মধ্যযুগের রাজপুত-শিখ-মারাঠার ত্যাগপূত জীবন সম্বন্ধে তাঁর অতুলনীয় গাথাগুলোয়। প্রাচীন ভারত-এর ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্যজীবনের মহিমা এই কালে তাঁর বহু রচনায় কীর্তিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আফ্রিকার বোয়ার-যুদ্ধে শক্তি- ও সভ্যতা-দর্পী ইয়োরোপ যে অবিশ্বাস্য বর্বরতার পরিচয় দেয় তাতে ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবি অনেকখানি সন্দিহান হন, আর শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল জ্ঞান করেন প্রাচীন ভারতের সরল নির্লোভ ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবনকেই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন। কবি সেই আন্দোলনে সর্বান্তঃকরণে যোগ দেন, কিন্তু তাঁর নব-আদর্শ-নিষ্ঠার ফলে ইংরেজ-বিদ্বেষের কোনো কথাই তাঁর মুখে উচ্চারিত হয় না, এক অসাধারণ প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি দেশের লোকদের বলেন ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে দেশের সবাইকে আপন জেনে ভালো-বাসতে, আর শাসকদের মুখাপেক্ষী না হয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সব করণীয় নিজেরা করতে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কবির লেখায় ও কাজে ভগবৎ-প্রেমের ও স্বদেশ-প্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয় প্রকাশ পায়।

প্রধানত শাসকদের পীড়নের ফলে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলন বোমা-বিভ্রাটের রূপ নেয়। যে অসহায়তা-বোধ থেকে তরুণ দেশপ্রেমিকদের একটি দল সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিত হয় কবি তার পরিমাণ সহজেই উপলব্ধি করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এক অসাধারণ

অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন ভারতবর্ষের মতো দেশের বিচিত্র জটিল সমস্যা ভারতের মহান ঐতিহ্যের অশেষ অর্থপূর্ণতা আর ভারতবর্ষের মতো দেশে সন্ত্রাসবাদের সমূহ অকার্যকারিতা। তাঁর সেই উপলব্ধি দ্বিধাহীন কণ্ঠে সেই কালে তিনি ব্যক্ত করেন তাঁর "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে।

এর পর থেকে তাঁর ঐকান্তিক প্রচারের বিষয় হয়—উগ্র জাতীয়তা পরিহার আর জ্ঞান শান্তি ও মৈত্রীর পথ অবলম্বন। শুধু ভারতে নয় বৃহত্তর জগতেও এই বাণী তিনি দীর্ঘকাল প্রচার করেন। তাঁর ছুটি সুপরিচিত গানে তাঁর পরিণত জীবনের এই চিন্তা পরম-হৃদয়গ্রাহী রূপ পেয়েছে, সেই ছুটি গানের প্রথমটির পদ হচ্ছে—

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে

আর দ্বিতীয়টির প্রথম পদ হচ্ছে—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব।

সেই দিনে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি কবির এই চিন্তাকে জ্ঞান করেছিলেন এক শ্রেণীর আদর্শবাদ, অর্থাৎ শুনতে ও ভাবতে ভালো, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে স্বল্পমূল্য। কিন্তু দুই মহাযুদ্ধের পরে আর সাম্প্রতিক কালে আণবিক অস্ত্রের সর্বধ্বংসী ক্ষমতার প্রমাণ পেয়ে অনেকেই বুঝতে পারছেন টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর মতো যুদ্ধবিরোধী আর শান্তি- ও মৈত্রীকামী একালের মহাপুরুষেরা কত বড়ো সত্য-দৃষ্টিসম্পন্ন মানব-বন্ধু। একালে সভ্যতার এক দারুণ সংকটে তাঁরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন মানুষের বাঁচার পথের। অবশ্য মানুষ বাঁচার পথে চলবে, না, মরার পথেই পা বাড়াবে, কে আর তা বলতে পারে।

বলা যেতে পারে কবির তেত্রিশ বৎসর বয়সে লেখা "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা প্রথম স্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাতে দেখা যায় এতকাল যে শুধু কাব্যচর্চায় তাঁর দিন কেটেছে তাতে তিনি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন আর বলছেন, এবার তাঁর কাজ হবে 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা' দেওয়া 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশা' সঞ্চারিত করা। যে আদর্শের নতুন প্রেরণা তাঁর লাভ হয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি বলছেন—

বলো মিথ্যা আপনার সুখ
মিথ্যা আপনার দুখ; স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।

তিনি আরো উপলব্ধি করছেন, বৃহৎ জগতের কাজে আত্মসমর্পণ করে আর সত্যকে জীবনের ধ্রুবতারা জেনে নির্ভয়ে তার দিকে অগ্রসর হতে হবে—

জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

কিন্তু কে সে? তার উত্তরে কবি বলেন—

জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো।

এখানে দেখা যাচ্ছে কবির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক চেতনার বা ভগবৎ-চেতনার সঞ্চার হয়েছে তার কাজ হচ্ছে মহত্তর জীবনের অভিমুখে এক প্রবল প্রেরণা-দান।—এমন প্রেরণার পথে চলে কবির কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হয় তার পরিচয় রয়েছে তাঁর নানা কবিতায় নাটকে গানে ও গদ্যরচনায়। শেষে তাঁর এই ধর্মবোধের কিছু ব্যাখ্যা তিনি দিতে চেষ্টা করেন অক্সফোর্ডে তাঁর হিবার্ট-বক্তৃতা-মালায় ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "মানুষের ধর্ম" বক্তৃতা-মালায়। "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। সেই বক্তৃতামালার ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

স্বার্থ আমাদের যেসব প্রয়াসের দিকে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে ; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।

কোন্ মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তাহলে এর জন্য সাধনা করতে হয় না।

আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজেই তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন।

দেখা যাচ্ছে "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় এক মহত্তর জীবন-চেতনার কথা তিনি যে ব্যক্ত করেছিলেন ধর্মজীবন বলতে সেই মহত্তর জীবন-চেতনাই তিনি উত্তরকালেও বুঝেছেন। সেই মহত্তর জীবন-চেতনা নিয়ত-বিকাশশীল, নব নব সার্থকতার পথে ধাবমান—কবির ভাষায়—

আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে।

প্রচলিত কথায় যাকে ধর্ম বলা হয় তা অবশ্য অনুষ্ঠানসর্বস্ব—মহত্তর জীবন-চেতনার কোনো লক্ষণই সাধারণত তাতে দেখা যায় না ; কিন্তু বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এমন সব বাণী আছে যা থেকে বোঝা যায় সেসবে ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকের কথাই ভাবা হয়নি, মহত্তর জীবন-চেতনা বলতে যা বোঝায় তার কথাও ভাবা হয়েছিল।

আর একালে, অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের পরে থেকে ধর্ম বলতে প্রধানত মানুষের মহত্তর জীবন-চেতনার মতো ব্যাপারই বোঝা হচ্ছে। গ্যেটে তাঁর ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্‌টার-এর শেষের দিকে ধর্ম সম্পর্কে এই মর্মের উক্তি করেছেন : নিজেকে শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, অবশ্য এই শ্রদ্ধা অহমিকা ও দুরাকাঙ্ক্ষাবর্জিত।

ভারতের নব জীবনারম্ভের মহান পথপ্রদর্শক রামমোহনের একটি অতি প্রিয় বাণী ছিল এই : The true way of serving God is to do good to man। একালের কোনো-কোনো খ্যাতনামা চিন্তাশীল অবশ্য ধর্মের উপরে জোর দেন নি ; তাঁরা ধর্মকে বরং অবিশ্বাস করেছেন, আর জোর দিয়েছেন বিজ্ঞানচর্চা ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির উপরে। কিন্তু সমসাময়িক কালের অনেক পাশ্চাত্ত্য মনীষী ধর্মবোধের উপরে নতুন করে জোর দিচ্ছেন, আর সে-ধর্মবোধ মূলত মহত্তর জীবন-চেতনা। এদের নেতৃস্থানীয় Albert Schweitzer-এর একটি উক্তি এই—

That we have lapsed into pessimism is betrayed by the fact that the demand for the spiritual advance of society and mankind is no longer seriously made among us...

Salvation is not to be found in active measures, but in new ways of thinking.

But new ways of thinking can rise only if a true and valuable conception of life casts its spell upon individuals.

The one serviceable world-view is the optimistic-ethical.

Civilisation and Ethics.

আমাদের দেশের অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার তুলনা করলে সহজেই চোখে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম অনুভূতিমূলক, কোনো তত্ত্বচিন্তা থেকে মুখ্যত তার উৎপত্তি নয়, কোনো তত্ত্বচিন্তার সঙ্গে তা নিবিড়ভাবে যুক্তও নয়। এ সম্বন্ধে তাঁর একটি কবিতা এই—

এ কথা মানিব আমি এক হতে দুই,
কেমনে যে হতে পারে জানি না কিছুই ;
কেমনে যে কিছু হয়, কেহ হয় কেহ
কিছু থাকে কোনো রূপে, কারে বলে দেহ,
কারে বলে আত্মা মন, বুঝিতে না পেরে
চিরকাল নিরথির বিশ্বজগতেরে
নিস্তব্ধ নির্বাক চিত্তে। বাহিরে যাহার
কিছুতে নারিব যেতে আদি অন্ত তার
অর্থ তার তত্ত্ব তার বুঝিব কেমনে
নিমেষের তরে। এই শুধু জানি মনে
সুন্দর সে, মহান সে, মহাভয়ংকর,
বিচিত্র সে, অজ্ঞেয় সে, মম মনোহর।
ইহা জানি, কিছুই না জানিয়া অজ্ঞাতে
নিখিলের চিত্তস্রোত ধাইছে তোমাতে।

তাঁর "মানবসত্য" প্রবন্ধেও কবি এক জায়গায় বলেছেন—

সেদিন অক্সফোর্ডে যা বলেছি তা চিন্তা করে বলা ; অনুভূতি থেকে উদ্ধার করে অন্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তির উপরে খাড়া করে বলা।

অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অথবা অন্যান্য প্রাচীন ধর্মচিন্তায় মূল ব্যাপার হচ্ছে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, অর্থাৎ যা জগৎরূপে প্রতিভাত হচ্ছে তার অতিরিক্ত কিছু, তা নাম তার যা-ই দেওয়া হোক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যতটা সত্য মানবজীবন তার চাইতে কম সত্য নয়। এর সমর্থনে তাঁর বহু উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে ; তাঁর "ধর্মের অধিকারে"র একটি উক্তি এই—

ব্রহ্মই পরিপূর্ণ সত্য এবং তাঁহাকেই পূর্ণভাবে পাইতে হইবে এই কথাটিকে খাটো করিয়া বলা তাঁহাদের (মহাপুরুষদের) কর্ম নহে—তাই তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, তাঁহাকে না জানিয়া যে মানুষ কেবল জপতপ করিয়াই কাটায় অন্তরদেবাশ্ত তদ্ ভবতি, তাহার সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়—তাঁহাকে না জানিয়াই যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে অপসৃত হয়, স কৃপণঃ—সে কৃপাপাত্র।

…বিচারই মানুষের ধর্ম। উচ্চ ও নীচ, শ্রেয় ও প্রেয়, ধর্ম ও স্বভাবের মধ্যে তাহাকে বাছাই করিয়া লইতেই হইবে।…মানুষ নিয়ত আপনার সর্বশ্রেষ্ঠকেই প্রকাশ করিবে ইহাই তাহার সাধনার লক্ষ্য।…

যে আপনার সর্বোচ্চকেই সর্বোচ্চ সম্মান না দেয় সে কখনই উচ্চাসন পাইবে না।

আর শেষের দিকে মানব-জীবনের মহত্তর পরিণতিই তাঁর মনোযোগ যেন বেশি আকৃষ্ট করেছে, যেমন, "মানুষের ধর্মে" তিনি বলেছেন—

মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্য-বোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌঁচেছে।…

জাগতিক ভূমা আমাদের জ্ঞানের পরিপূর্ণতার বিষয়, মানবিক ভূমা আমাদের সমগ্র দেহ মন ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়…

পরমাত্মা মানবপরমাত্মা ইনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ইনি আছেন সর্বদা জনে-জনের হৃদয়ে।

—এর থেকে অনেকখানি নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে রবীন্দ্রনাথ একালের মানুষ, তাঁর ধর্মবোধ একালেরই ধর্মবোধ, তা প্রাচীন শব্দ ও রূপ-কল্পনা যতই তিনি ব্যবহার করে থাকুন।—বাউলদের প্রতি বহু জায়গায় তিনি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। বাউলদের সঙ্গে তাঁর দুই ক্ষেত্রে বড়ো মিল রয়েছে—বাউলদের মতো তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত, আর বাউলদের মতনই তিনি অসীম ও অরূপের প্রেমিক। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তাঁর খুব বড়ো অমিল এই ক্ষেত্রে যে বাউলরা বৈরাগী ও মরমী, কিন্তু তিনি জীবনবাদী ও সভ্যতার ক্রমোৎকর্ষে আস্থাবান। হয়তো এই গূঢ় কারণেই তিনি প্রাচীন ধর্মপন্থী, ভক্তিমার্গী, বাউল, কারো মতনই গুরুবাদী নন। এ সম্বন্ধে তাঁর এই বিখ্যাত উক্তিটি উচ্চারিত হয়েছে তাঁর এক নায়কের মুখে—

আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন—গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার সঙ্গেও কিঞ্চিৎ পরিচয় আমাদের হয়েছে। এ স্বাভাবিক, কেননা

জীবন ও জীবনের প্রচেষ্টা আসলে অবিভাজ্য। তবু নানা ভাগে ভাগ করেই আমরা জীবন ও জীবনের প্রচেষ্টা বুঝতে চেষ্টা করি। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা সম্বন্ধে এইবার একটু খোঁজ নেওয়া যাক। রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের যোগ অঙ্গাঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার সঙ্গেই আমরা বুঝতে চেষ্টা করব সমাজ সম্বন্ধেও তাঁর চিন্তা।

প্রথম যৌবনেই রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানি প্রবন্ধ-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সেইগুলি এখন প্রচলিত নেই—"অচলিত সংগ্রহে" স্থান পেয়েছে। সেইসব প্রবন্ধের মধ্যেও উপভোগ্য রচনা কিছু কিছু আছে; দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে শ্লেষোক্তিও দুই-একটিতে চোখে পড়ে। তবে মোটের উপরে সেইসব লেখার জগৎ সংকীর্ণ জগৎ—কবি যেন নিজের সঙ্গে, অথবা একটি সুপরিচিত বন্ধুমহলে, আলাপ করছেন, বৃহত্তর দেশ বা জগৎ যেন তাঁর চিন্তার বিষয় নয়। ব্যাপক মানব-সমাজের সঙ্গে লেখকের যোগের অভাব ঘটলে তাঁর রচনার আবেদনে ত্রুটি ঘটা স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথকে প্রতিভাদীপ্ত প্রাবন্ধিকরূপে প্রথম দেখা যায় "সাধনা" পত্রিকায়, তাঁর প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে। এর পূর্বেও দু-একটি প্রবন্ধ (যেমন তাঁর ২৭ বৎসর বয়সে লেখা "হিন্দু বিবাহ"-এ) তাঁর শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু শক্তির প্রকাশ সেখানে আশানুরূপভাবে সুন্দর নয়। "সাধনা"র যুগে দেখা যায় একই সঙ্গে তিনি দক্ষহস্তে কলম চালিয়েছেন সমাজ রাষ্ট্র ও শিক্ষা বিষয়ে—সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তো বটেই।

কবির ধর্মবোধ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি তাঁর নবযৌবনে তাঁর পরিবেশে স্বদেশ- ও স্বজাতি-চেতনা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু প্রবল বললে সব কথাটা বলা হয় না—একটি উল্লেখযোগ্য দলের ভিতরে এই চেতনা হয়েছিল উৎকট। তাদের আর্যামির দম্ভ ও আরো নানা উদ্ভট চিন্তার প্রতি কবি বহুবার শাণিত বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেন। এই সংগ্রহেও তার পরিচয় পাওয়া যাবে। নিজে প্রবলভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির অনুরাগী হয়েও এমন আঘাত হানা কবি প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেছিলেন, কেন না, তিনি চাচ্ছিলেন দেশের সত্যকার শ্রীবৃদ্ধি যা সম্ভবপর স্বভাব ও জ্ঞানের পথে, অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক পন্থায় কখনো নয়। বহুকালের নানা আচার ও সংস্কারের ভারে ব্যাহত হয়েছিল আমাদের দেশের জীবন ও চিন্তার গতি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে নানা কারণে বর্ধিত জাতীয় অহমিকা সেই ব্যাহত গতিতে আরো বিচিত্র বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। সেইসব অদ্ভুতত্বের সঙ্গে সংগ্রাম রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় স্বাক্ষর রেখে গেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে স্বভাব ও কাণ্ডজ্ঞান যে নতুন মহিমা লাভ করল এজন্য সে-সাহিত্য আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ হয়েছে।

কবি তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিজে বলেছেন—

> আমাদের ব্রাহ্ম-পরিবার আধুনিক হিন্দুসমাজের বাহ্য আচার-বিচার ক্রিয়া-কর্মের নানা আবশ্যিক বন্ধন থেকে বিযুক্ত ছিল। আমার বিশ্বাস সেই কিছু-পরিমাণ দূরত্ব-বশতই ভারতবর্ষের সর্বজনীন সর্বকালীন আদর্শের প্রতি আমার গুরুজনদের শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত প্রবল।…সেই উৎসাহ আমার মনকে একটি বিশেষ ভাবে দীক্ষিত করেছে।—সেই ভাবটি এই যে, জীবনের যা কিছু মহত্তম দান তার পূর্ণ প্রকাশ আমাদের অন্তরপ্রকৃতির মধ্য থেকেই। আমাদের স্বভাবসীমার বাইরে শ্রেষ্ঠ জিনিসের অভাব নেই, লোভনীয় পদার্থ অনেক আছে, সে-সমস্তকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনে যদি না আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তাদের আত্মসাৎ করি।

এই চিন্তার দ্বারা চালিত হয়ে ইংরেজি ভাষার সেই সর্বব্যাপী প্রভাবের দিনে তিনি বার-বার চেষ্টা করেন প্রাদেশিক রাষ্ট্রসভায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাঙলার চর্চা প্রবর্তন করতে। ইংরেজের মুখাপেক্ষী না হয়ে দেশের লোক শিক্ষাদান, দেশের জলকষ্টনিবারণ, এসব গঠনমূলক কাজের ভার নিজেরা নিক, এ প্রস্তাবও বার-বার তিনি সর্বসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করেন।

ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ভারত-ভাগ্য-বিধাতার কোনো বিশেষ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে কিনা কবি এই প্রশ্নেরও সম্মুখীন হন। এ সম্বন্ধে তাঁর খুব উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা"।

ভারতবর্ষের নিজস্বতা সম্বন্ধে চেতনা আরো বহুভাবে কবিকে চিন্তা- ও কর্ম-তৎপর করে। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ তার ভারতশাসনকে করেছিল বহুল পরিমাণে যন্ত্রধর্মী। তাতে ইংরেজের প্রতাপ ও দম্ভ প্রকাশ পাচ্ছিল খুব, আর সেই অনুপাতে অভাব ঘটেছিল ভারতের প্রতি তার মমত্ববোধের। কবির আত্মসম্মান-বোধ এতে গভীরভাবে পীড়িত হয়েছিল আর ইংরেজের এই ঔদ্ধত্যের প্রতি আঘাত হানতে তিনি কখনো পশ্চাৎপদ হন নি। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতা সম্পর্কে তাঁর প্রতিবাদ সুবিদিত, তার বহু পূর্বে লর্ড কার্জনের ঔদ্ধত্যের প্রতিও তাঁর অকুণ্ঠিত প্রতিবাদ স্মরণীয় হয়ে আছে।—কিন্তু এইসব প্রতিবাদে কবির অপূর্ব একটি বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পেয়েছে। ভারতবর্ষের প্রতি ব্যবহারে ইংরেজ তার সাম্রাজ্যিক স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত; সেজন্য নিষ্ঠুর তার লোভ, বীভৎস তার আচরণ। কিন্তু ইংরেজকে এমন বর্ণে চিত্রিত করেও তার প্রতি শ্রদ্ধা তিনি হারান নি, কেননা একটি বড়ো সাহিত্য ও সংস্কৃতির সে বাহন, একালে-অশেষ-অর্থপূর্ণ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতাও সে ভারতবর্ষে বহন করে এনেছে। বিপক্ষ সম্বন্ধে এমন মনোভাবকে অসাধারণ বলতেই হবে। কিন্তু একটু ভাবলেই বুঝতে পারা যায় এই হওয়া উচিত সভ্য ও আলোকপিয়াসী মানুষের মনোভাব। কেননা, বিপক্ষের প্রতি ঘৃণা ও অন্ধতা শুধু বিপক্ষকেই আঘাত করে না, সেই ঘৃণা- ও অন্ধতা-পোষণকারীকেও গভীরভাবে আহত করে। অবশ্য এ পথ কঠিন। কিন্তু মানুষের সত্যকার কল্যাণের পথ কোনোদিনই সহজ নয়। কবির শেষ বড়ো লেখা "সভ্যতার সংকটে" দেখা যায় ইংরেজের—অথবা ইয়োরোপীয় সভ্যতার—প্রতি তাঁর এই শ্রদ্ধা নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। তবু তিনি সেই লেখাটিতেই বলেছেন—

> …মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।

জাতীয়তা কী? সব দেশে জাতিগঠন কি একই পদ্ধতিতে হয়েছে? তাদের লক্ষ্য কি একই? এইসব প্রশ্ন এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে প্রবল হয়েছিল। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের নিজস্বতার সন্ধানই ছিল তার মূলে। কবি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ভারতীয় সভ্যতার মূল আশ্রয় সমাজ আর ইয়োরোপীয় সভ্যতার মূল আশ্রয় রাষ্ট্রনীতি। তাঁর মতে—

> সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য তবে আমরা ভুল করিব।

কবির এই ধরনের কথা থেকে ধারণা হতে পারে ভারতবর্ষের পথ আর য়ুরোপের পথ স্বতন্ত্র, এই কবির বক্তব্য। এক সময়ে এমন একটা ধারণার দিকে তিনি যে ঝুঁকেছিলেন তা বলা যায়। কিন্তু তাঁর ১৯১৭ সালের বিখ্যাত "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" লেখাটিতে দেখা যায় তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে যা শ্রেষ্ঠ, মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ সার্থকতা এনে দিতে পারে, তা সব মানুষের জন্য কাম্য, তা পাবার জন্য সবাইকে যত্নবান হতে হবে, যারা তা দিতে পারে তাদের তা দিতেও সচেষ্ট হতে হবে। কবির উক্তি এই—

> যে জাতি কোনো বড় সম্পদ পাইয়াছে সে তাহা দেশে দেশে দিকে দিকে দান করিবার জন্যই পাইয়াছে।… য়ুরোপের প্রধান সম্পদ বিজ্ঞান এবং জনসাধারণের ঐক্য-বোধ ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ। এই সম্পদ এই শক্তি ভারতকে দিবার মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজ-শাসনের

বিধিদত্ত রাজপরোয়ানা।···আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায়, দুর্বলতা যথেষ্ট আছে, সে-কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্ম-কর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এক কোণের বাতিটা মিট-মিট করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর-এক কোণের বাতি জ্বালাইবার দাবি নাই, এ কাজের কথা নয়। যে-দিকের সলতে দিয়াই হ'ক আলো জ্বালাই চাই।··· ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে-আত্মা অপরিমেয়, যে-আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে-আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধুলায় মুখ লুকাইয়া···যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু,—সেই বহু শতাব্দীর আবর্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধূলি-পুঞ্জে শুষ্ক পত্রে সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাতসূর্যকে ম্লান করিল, নব নব অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবন-ধর্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিককেই মুক্তি দিতে হইবে তবেই নিত্য-সম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব, সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুজয়ী, যে চিরজাগরূক, চিরসন্ধানরত, যে বিশ্বকর্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগে যুগে নব নব তোরণদ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।

স্মরণ করবার আছে কবি "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম"-এর বহু পূর্বে লেখা তাঁর "ততঃ কিম্" প্রবন্ধে বলেছিলেন, প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্যজীবনের আদর্শ এমন একটি অর্থপূর্ণ আদর্শ যা শুধু হিন্দুর জন্য ভালো নয়, সব মানুষের জন্যই ভালো।

কবি তাঁর কালের হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা নিয়েও কম চিন্তা করেন নি। এই বিরোধে তিনি খুব দুঃখ পান। মূল সমস্যাটি সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য দাঁড়ায় এই: সামাজিক ব্যবহারে হিন্দুর অনুদারতা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে যেমন একটি বড়ো বাধা তেমনি বড়ো বাধা ধর্মচিন্তা সম্পর্কে মুসলমানের অনড় মনোভাব (কবির ভাষায় এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চির প্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের সংঘর্ষ)। এই দিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায় সমস্যাটি কত কঠিন। কিন্তু এর সমাধান কোথায়? কবির উত্তর—

> মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। যুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্য যুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচছে হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ···হিন্দুমুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে।

আমাদের দেশে শুধু হিন্দু আর মুসলমানই নেই, আছে বিচিত্র-মতাবলম্বী বিচিত্র-আচার-পন্থী নানা প্রদেশে ও অঞ্চলে বিভক্ত নানাভাষাভাষী প্রায় সংখ্যাহীন দল উপদল। এত বিচিত্র উপাদান নিয়ে কেমন করে গঠিত হবে একটি সুসংহত জাতি ও রাষ্ট্র—এই দেশের সামনে সমস্যা। স্বাধীনতা লাভের পরে এই সমস্যাটি যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও এর গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর "হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধে এই সমস্যার উপরে তিনি যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য এই: দেশের এত বৈচিত্র্য ও জটিলতা যথাসম্ভব অস্বীকার করে একটি অপেক্ষাকৃত সহজ সরল মীমাংসার দিকে আমাদের কারো কারো মন যেতে পারে, কিন্তু সে-পথে এই সমস্যার মীমাংসা সহজ হবে না, বরং আরো কঠিন হবে। বৈচিত্র্য যেখানে যথার্থই আছে সেখানে তাকে স্বীকার করতে হবে—স্বীকার করেই তার মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে। যেমন হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমান-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্থাপনা। আপাত-দৃষ্টিতে সমস্ত দেশের

অগ্রগতির সঙ্গে এর যোগ ঠিক নেই। কিন্তু হিন্দুর বিশেষ জীবনধারা ও চিন্তাধারা আর মুসলমানের বিশেষ জীবনধারা ও চিন্তাধারা যখন যথার্থই আছে, তা যখন মায়া নয়, তখন তা যথাসম্ভব ভালো রূপ পাক এই সবার চেষ্টা হওয়া উচিত। ভালো রূপ বলতে কী বোঝায় তার নির্দেশ পাওয়া যায় কবির এই উক্তি থেকে—

> বিশেষত্ব বর্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দুদিনের ফাঁকি —বিশেষত্বকেই মহত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।

অর্থাৎ বিশেষত্বকে স্বীকার করতে হবে আর এমন আয়োজন করতে হবে যাতে সেই বিশেষত্ব মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হতে পারে, অন্য কথায়, দেশের সাধারণ জীবন-ধারার বাধা না হয়ে মহৎ সহায় হতে পারে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ও মুসলমানের চিন্তা-ভাবনার বৈশিষ্ট্য স্থান পাক, সেই সঙ্গে 'বিশ্ব' অর্থাৎ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান বলে যা পরিচিত তাও স্থান পাক। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের তাদের পুরোনো জায়গায় অনড় হয়ে বসে থাকা আর সম্ভবপর হবে না, বিশ্বের যা শ্রেষ্ঠ চিন্তা-ভাবনা তার স্পর্শ পেয়ে তারাও যোগ্য-ভাবে বদলাবে।

লক্ষ্য করবার আছে কবি দেশের লোকদের প্রাচীন সংস্কার সরাসরি বদলাতে চান নি, কিন্তু সে সবকে সংস্কৃত ও সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন মহত্তর জীবন-চেতনার দ্বারা।

হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় দেশে স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্থানও সে-সবে হয়েছে। কিন্তু ফল আশানুরূপ হয়েছে কি? কেউ কেউ বলতে পারেন, এই প্রশ্ন করবার সময় এখনো হয়নি। তা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু কবির মূল যে ইঙ্গিত—বিশেষত্বকে মহত্ত্বে উত্তীর্ণ করতে হবে—সেটি যেন দেশের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান বাঙালি মাদ্রাজি মারাঠি পাঞ্জাবি কেউ কখনো না ভোলে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন সচেতন ছিলেন ব্যক্তির জীবনের মূল্য সম্বন্ধে তেমনি যৌথ-জীবনের মূল্য সম্বন্ধেও। অল্পদিনে রাশিয়ায় যৌথ জীবনের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে দেখে তিনি গভীর আনন্দ লাভ করেছিলেন; তাঁর বিখ্যাত "রাশিয়ার চিঠি"র এক জায়গায় এই মন্তব্যটি রয়েছে—

> রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভালো মন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয় কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থি-মজ্জায় মনেপ্রাণে হাজারখানা হয়ে জাঁকড়ে আছে তার কতদিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্সো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে পর্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে; ভগ্ন ভাবনা সংশয় কিছু মনে নেই।

কিন্তু রাশিয়ার সমাজ- ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ব্যক্তির মূল্য যে কম এটি তিনি ভালো বলে মেনে নিতে পারেন নি, সে-সম্বন্ধেও তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট—

> শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে—কিন্তু ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না।

অন্যত্র—

> সন্দেহ নেই যে, একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর, তার ক্রিয়ায় একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত, যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগ সাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্বদাই ঘটে। তাছাড়া সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাসে চিত্তের ও চরিত্রের বলহানি করে—এর সফলতা যখন বাইরের দিকে দুই-চার ফসলে হঠাৎ আঁজলা ভরে তোলে, ভিতরের শিকড়কে দেয় মেরে।

তিনি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে গেছেন সমবায়নীতির প্রতি—

> আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধনউৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক এই আমি কামনা করি।

আমাদের গ্রামগুলোর উন্নতি সম্পর্কে তাঁর এই উক্তিটি খুব অর্থপূর্ণ—

আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনো ইচ্ছে করিনে যে গ্রামতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেই রকম সংস্কার, বিদ্যা, বিশ্বাস ও কর্ম যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত—বর্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ। বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী, যদিও তার হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ সে-পরিমাণে ব্যাপক হয়নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে-প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।

মানবপ্রকৃতি কোনোদিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না হোক, এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনার বিষয় আর এ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। অসহযোগ আন্দোলনের দিনে দেশের সবাইকে চরকা কাটতে বলা হয়েছিল; মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি অসাধারণভাবে শ্রদ্ধান্বিত হয়েও তিনি সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, কেননা তাঁর ধারণা হয়েছিল এমন একঘেয়ে কাজে অন্য লাভ যাই হোক মনের উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা নেই।

মানুষের মহত্তর পরিণতিতে তাঁর অশেষ আস্থা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অপূর্ব "নারী" প্রবন্ধটিতেও।

রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে কবি আর জীবন-জিজ্ঞাসু। কবিরূপে তিনি চিরদিন আনন্দ প্রকাশ করেছেন সৌন্দর্যে—যেমন প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যে, তেমনি মানুষের মনের অন্তহীন সৌন্দর্যে। মানুষের ক্ষুদ্রতা ও ব্যর্থতা দুঃখও দিয়েছে তাঁকে খুব—তারও মূলে সৌন্দর্যবোধ। আর জীবন-জিজ্ঞাসুরূপে তিনি ভেবেছেন জীবনের প্রকৃত সার্থকতার কথা, সম্মুখীন হয়েছেন জীবন সম্বন্ধে এইসব মূল প্রশ্নের—বেঁচে থেকে কী করব? ধর্ম কী? ঈশ্বর কী? দশের সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ? বিশ্বের সঙ্গে আমার কী সম্বন্ধ? আমার আমিত্ব আমি চাই, না বিলুপ্ত করতে চাই? আমার আমিত্ব, অর্থাৎ সবার আমিত্ব সমাজের ও রাষ্ট্রের কোন্ রূপে সার্থক হবে? এইসব মূল প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্য-প্রচেষ্টায়। তাই প্রচলিত অর্থে সমাজতত্ত্ববিদ্ বা রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ তিনি নন। তিনি সমাজতত্ত্ববিদ্ ও রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ যেহেতু তিনি ব্যাপক-জীবন-জিজ্ঞাসু—কেমন করে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের যোগ্য লালন-ক্ষেত্র হবে সেই তত্ত্বও তাঁর জিজ্ঞাসার বিষয় হয়েছে। সর্বোপরি তাঁর জিজ্ঞাসার বিষয় হয়েছিল তাঁর কালে তাঁর দেশের জীবন—তাতে রাষ্ট্র, ব্যক্তি, দেশের বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়, বৃহত্তর দেশ ও জগৎ সবের বিভিন্ন ও মিলিত সমস্যা কী, এইসব। এ-সবের এমন উত্তর তিনি খুঁজেছিলেন যাতে শুধু তাঁর কালেরই নয় সবকালের মানবমন খুশি হতে পারে। এই থেকেই তাঁর চিন্তার মর্যাদা।

রবীন্দ্রনাথের যে মূল চিন্তা—জীবনের সুমহৎ পরিণতি—শিক্ষা সম্বন্ধে সেইটি যে তাঁর প্রধান চিন্তা হবে এ স্বাভাবিক, কেননা, শিক্ষা সম্বন্ধে এইটি বা এর অনুরূপ চিন্তা দেশদেশান্তরের মনীষীদের প্রধান চিন্তা।

রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তাই প্রকাশ পেয়েছে এই মহৎ-উদ্দেশ্যযুক্ত শিক্ষার জন্য তিনি যে আয়োজন করেছেন বা করতে চেয়েছেন তাতে। এক্ষেত্রে, অন্তত আমাদের দেশে, তাঁর দান অসাধারণভাবে মৌলিক।

স্কুল-কলেজে শিক্ষা তাঁর নিজের খুব কমই হয়েছিল। সেজন্য নিজেকে তিনি বলেছেন স্কুলপালানো ছেলে। কিন্তু পুরোপুরি স্কুলপালানো ছেলে তাঁকে বলা যায় না, কেননা, স্কুল থেকে তিনি পালিয়েছিলেন বটে কিন্তু বই থেকে পালান নি। তাঁর নিজের জীবনে এই যে তিনি স্কুলের বন্ধনকে স্বীকার করেন নি অথচ পড়তে কম আগ্রহবোধ করেন নি, আর জল স্থল আকাশ সূর্যোদয় এসব যে ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী—অসীম আনন্দ ও উল্লাসভরা সঙ্গী, মুখ্যত তাঁর নিজের জীবনের এইসব অভিজ্ঞতা থেকেই রূপ পেয়েছে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাভাবনা।

বলা যেতে পারে শিক্ষা সম্বন্ধে কবির প্রধান চিন্তা হচ্ছে এইসব: মানুষের, বিশেষ করে বালক-বালিকাদের, দেহমনের বিকাশের উপরে প্রকৃতির প্রভাব; শিক্ষার যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থার অনুপযুক্ততা; শিক্ষার, তথা জীবনের, লক্ষ্য সম্বন্ধে দেশে চেতনার অভাব; শিক্ষার বিকিরণে বিচিত্র বাধা।

শিক্ষা সম্বন্ধে কবি জোর দিয়েছেন প্রধানত পরিবেশ ও শিক্ষকের উপরে। পাঠ্যতালিকা, শিক্ষণ-রীতি এসবও তাঁর মনোযোগ কম আকর্ষণ করে নি; কিন্তু তাঁর বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে শিক্ষার যোগ্য পরিবেশ রচনা, যোগ্য শিক্ষক লাভ, এই দুয়ের দিকেই, এই মনে হয়। শিক্ষার ব্যাপারে এই দুয়ের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে।

মানুষের দেহ হৃদয় ও মনের বিকাশে প্রকৃতির আনুকূল্য কত অর্থপূর্ণ সে সম্বন্ধে কবির একটি বিখ্যাত উক্তি এই—

> খোলা আকাশ খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানব-সন্তানের শরীর-মনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার একথা বোধ হয় কোনো কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। যখন বয়স বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলস্থল-আকাশ বায়ুর চিরন্তন ধাত্রী-ক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি, তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া থাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাঁহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণ রূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও—তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না।...হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিজ্ঞ, তুমি, কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, একথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই; তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষ লীলা-স্পর্শ অনুভব করিতে দাও—তাহা তোমার ইন্‌স্পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্ন-পত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়ো না।

আমাদের দেশ পল্লীপ্রধান। কাজেই আমাদের দেশের লোকেরা এতদিন সহজভাবেই প্রকৃতির কোলে বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজ শাসনের কালে দেশের অবস্থায় বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটল। শহর ও শিল্পকেন্দ্রগুলো বেড়ে উঠতে লাগল, সেসবে অনেকে অতি-শ্রীহীনভাবে ভিড় জমাল। আর রাজভাষা ইংরেজি আমাদের মনোযোগ অতিরিক্ত পরিমাণে আকর্ষণ করল। অথচ ইংরেজি বিদ্যা যা আমাদের লাভ হল অনেক ক্ষেত্রেই তা অত্যন্ত খুঁতো—সভ্য মানুষের জন্য অশোভন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দেশের জীবনে যে এতখানি অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে-সম্বন্ধে চেতনার পরিচয় পাওয়া গেল না। এই পরিস্থিতিতেই রবীন্দ্রনাথ দেশের সামনে তাঁর অতিশয় অর্থপূর্ণ শিক্ষাদর্শন ব্যক্ত করলেন। অতিশয় অর্থপূর্ণ আমরা বলছি এই জন্য যে অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া কি ব্যক্তি কি জাতি সবারই জন্য একটা বড়ো রকমের মুক্তি। অবশ্য সেই মুক্তি যে আমরা পুরোপুরি পেয়েছি তা বলা যায় না। তবে আমাদের শিক্ষার অবস্থার অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে অনেকখানি চেতনা দেশের শিক্ষিত মহলে দেখা যাচ্ছে, এ মিথ্যা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, মাতৃভাষা আজ আর অবহেলিত নয়—তার গৌরবের আসন লাভ হয়েছে, অবশ্য যদিও তার যথোচিত বিকাশের এখনো ঢের বাকি। ব্যাপক জনশিক্ষার জন্যেও চেষ্টা হচ্ছে।

শিক্ষা-সম্বন্ধে আমাদের পারিবারিক যেসব বড়ো

বাধার কথা কবি বলেছেন, যেমন, পরিবারের কর্তা-ব্যক্তিদের উৎকট সাহেবিয়ানা, সেসবও আজ বদলে গেছে বলা যায়। উৎকট সাহেবিয়ানা আজ আর দশজনের সরব বা নীরব বাহবা পায় না যদিও কিছু বেশি বিত্তশালীদের চালচলন আজো আপত্তিকর। তবু আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ও চালচলন যে পরিবারের বালকবালিকাদের সুশিক্ষার অনুকূল হয়েছে এমন কথা বলার দিন আসতে এখনো বহু দেরি। কিন্তু তার কারণটি একটি বড়ো ব্যাপার, সংক্ষেপে বলা যায় সেটি হচ্ছে—আমাদের জীবনে চিন্তা আশা সংকল্প সবেরই অস্পষ্টতা বা ক্ষীণতা। এ সম্পর্কে কবির উক্তি এই—

> আমার কোনো-এক বন্ধু ফলিত জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যেসব মানুষ বিশেষ কিছুই নহে, যাহাদের জীবনে হাঁ এবং না জিনিসটা খুব স্পষ্ট করিয়া দাগা নাই, জ্যোতিষের গণনা তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক দিশা পায় না, তাহাদের সম্বন্ধে শুভগ্রহের ও অশুভ-গ্রহের ফল কী তাহা হিসাবের মধ্যে আনা কঠিন। বাতাস যখন জোরে বহে তখন পালের জাহাজ হুহু করিয়া দুইদিনের রাস্তা একদিনে চলিয়া যাইবে, একথা বলিতে সময় লাগে না; কিন্তু কাগজের নৌকাটা এলোমেলো ঘুরিতে থাকিবে, কি ডুবিয়া যাইবে, কি কী হইবে তাহা বলা যায় না—যাহার বিশেষ কোনো একটা বন্দর নাই তাহার অতীতই বা কী আর ভবিষ্যৎই বা কী।…
>
> কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড় জিনিস যাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়ো আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তাহা নহে; কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মস্ত কথা।…
>
> …শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব, এবং আমরা কী শিখিব, এই দুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার বেশি ধরে না।
>
> চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে কোনো বড়ো ডাক ডাকিতেছে না, কোনো বড়ো ত্যাগে টানিতেছে না।…
>
> রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুখে কোনো বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই।
>
> তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি-মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্‌সেন্‌ভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে, এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা—এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে একথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।

মানুষের দেহমনের সুপরিণতিতে প্রকৃতির সংস্পর্শ গভীরভাবে অর্থপূর্ণ—শিক্ষার ক্ষেত্রে কবির এই চিন্তা যেমন মহামূল্য, তেমনি মহামূল্য তাঁর এই চিন্তা যে আশা লক্ষ্য সংকল্প এসবের অভাব ঘটলে মানুষের জীবন হয় স্রোতের 'পরে কাগজের নৌকার মতো অর্থহীন ক্ষণিকের খেলনা। প্রকৃতির প্রভাবের মহিমা আর আশা লক্ষ্য ও সংকল্পের নীরব মহিমা তিনি মূর্তিমন্ত দেখেছিলেন প্রাচীন ভারতের তপোবনের গুরু ও শিষ্যদের জীবন-যাত্রায়। সেই মহৎ আদর্শের একালের উপযোগী রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে।

তাঁর প্রচেষ্টা কতটা ফলবতী হয়েছে তার চাইতেও বড়ো প্রশ্ন, তাঁর পরম অর্থপূর্ণ উপলব্ধি ও লক্ষ্য অনুধাবন করতে আমরা কতটা প্রয়াসী হয়েছি।*

* সাহিত্য আকাদেমির উদ্যোগে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর ধর্ম রাষ্ট্র শিক্ষা খণ্ডের ভূমিকা। ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গর বৈশাখ ১৩৬৭ সংখ্যায় মুদ্রিত।

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

চব্বিশ

'O Satan, prends pitie de ma longue misere!'

"রফিকুজ্জামানের সহিত জুলেখার শাদির দিন একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, এই স্থলে তাহার বিবরণ পেশ করিতেছি। কারণ আমার মনে সেই ঘটনাটি ধোকা সৃষ্টি করিয়াছে। আর শয়তান সর্বত্র ওত পাতিয়া বেড়ায়। বন্ধু আদমের জীবনের সমুদয় ক্ষেত্রে সে ফাঁদ পাতে।…

"জোহরের নমাজের সময় শাদির মজলিশ বসিয়াছিল। মসজেদের ভিতর এবং বাহিরে কাতারে২ ইলাকার মোছলেমগণ দাওয়াত এবং বিনা-দাওয়াতেই হাজের ছিলেন। হরিণমারার ছোটগাজি মইছর রহমান সকল আয়োজনের তদারক করিতেছিলেন। বড়গাজি সইছর রহমান তৎকালে কলিকাতায় ছিলেন। খত লিখিয়া জানান জে, পরে আসিয়া দুলহা-দুলহিনের নজরানা পেশ করিবেন। প্রকৃত কথা কী, এতিম-খানার ওই খুবছুরত লড়কিকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাহার প্রতি খোশ ছিলেন।…

"শাদির সময় দুলহিন আনিসুর রহমানের বাড়িতে ছিল। তিনিই তাহার মুরুব্বিপদে বহাল, ফলে দুলহিনের এজিন (সম্মতি) লইবার নিমিত্ত উকিল ও দুইজন গাওয়াহ্ (সাক্ষী) তাঁহার বাড়ি রওনা হইয়াছেন। এমত সময়ে বাহিরে হল্লা শুনিতে পাইলাম। লোকসকল 'ধর ধর! মার মার!' বলিয়া চিৎকার করিতেছিল। কী হইয়াছে জানিতে চাহিলে ছোট-গাজি বাহিরে গেলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, এক বেশরা মস্তান জোর করিয়া মসজেদে ঢুকিতে চেষ্টা করে। লোকে তাহাকে ধাক্কা মারিতে মারিতে ভাগাইয়া দেয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মস্তানটি রুগ্ন ছিল বলিয়াই বোধ করি মারা পড়িয়াছে।…

"শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম। দেলে আচানক

ধাক্কা বাজিল। আমার মুখের চমক ছোটগাজিছাহেবের নজরে পড়িয়া থাকিবে। তিনি আমার পার্শ্বে বসিয়া অনুচ্চ স্বরে কহিলেন, কোনও প্রকার ঝামেলার ডর নাই। বাদশাহী শড়কে এইরূপ দৃশ্য অভাবিত নহে জে, কখনও-কখনও ফকিরমস্তান-হিন্দুসাধুদিগেরও লাস দেখা যায়। বিমার, পেরেসানি বিবিধ কারণে উহারা পথিমধ্যেই ইন্তেকাল করে। এই কথা বলিয়া ছোটগাজিছাহেব উচ্চহাস্য করিলেন। মজলিসের উদ্দেশে ফের কহিলেন, বেশরা মস্তান দেখিলেই হজরত তাহাদের ভাগাইয়া দিবার ফতোয়া জারি করেন নাই কি? মোছলেমবৃন্দ সমস্বরে সায় দিলেন।···

"শাদি চুকিয়া গেলে লোকসকল খানায় বসিল। সেই সময় ছোটগাজিছাহেবকে নিরালায় ডাকিয়া পুছ করিলাম, মস্তানের লাস কোথায় পড়িয়া আছে, একবার দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি ঈষৎ বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবত মোজেজাদর্শনের ইচ্ছায় কহিলেন, হজরতের ইচ্ছা হইলে আপত্তি করি, সাধ্য কী? তবে মস্তানটি অর্দ্ধ-নাঙ্গা। একটু অপেক্ষা করুন। লাসটি ঢাকা দিতে একটুকরা কাপড় সংগ্রহ করি। পশ্চাতে উহার নিকট যাইবেন।···

"হা খোদা! কাহাকে দেখিয়াছিলাম? কাপড় তুলিলে মুখখানি দেখামাত্র আমার মাথায় যেন বাজ পড়িল। সারা অঙ্গুদ শিহরিয়া উঠিল। অতি কষ্টে মনোভাব দমন করিলাম। ছোটগাজিছাহেব হয়ত ভাবিয়াছিলেন, লাসটিকে আমি জিন্দা করিব! তাঁহাকে হতাশ দেখাইতেছিল। মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছি, আত্মসম্বরণ করিতেছি, ছোটগাজিছাহেব মৃদু-স্বরে কহিলেন, বেশরা মস্তান রাত্রে এখানে পড়িয়া থাকিলে শৃগাল-কুক্কুরে ছিঁড়িয়া খাইবে। জবাবে কহিলাম, জন্মকালে উহার কানে নিশ্চিত আজান শোনানো হইয়াছিল। সেকারণে বেশরা হইলেও এ-ব্যক্তি মোছলেম গণ্য হইবেক। উহার দাফন-কাফন করা কর্ত্তব্য। ছোটগাজিছাহেব ঘন২ মাথা নাড়িয়া আমার ফতোয়ায় সায় দিলেন।···

"সেইদিন সন্ধ্যার মধ্যে শরা-ভ্রষ্ট বেচারা ফরিদ-উদ্-জামান-এর লাসের দাফন-কাফন হইল। শাদি-মহফিলের তাবৎ লোক লাসের জানাজায় সমবেত হইয়াছিল। তাহারা নিশ্চয়ই আমার এই ফতোয়ায় বিস্মিত হইয়াছে ভাবিয়া এশার নমাজে কৈফিয়ত দিব ভাবিলাম। কিন্তু মুখে কথা সরিতেছিল না। বেরাদানে এছলাম! সম্বোধন করিয়াই কান্না আসিল। তাহা দেখিয়া সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিল।···

"রাত্রে চাঁদনী ছিল। এবাদতখানায় দাঁড়াইয়া আছি, সেইসময় দেখিলাম পুষ্করিণীর পানির উপর দিয়া একটি ছায়াহাঁটিয়া আসিতেছে। ঘাটের সোপানে উঠিয়া ছায়াটি হাওয়ার স্বরে কহিল, এইবার তুমি সত্যই বদি-উজ-জামান হইলে!···

"কহিলাম, কেন একথা কহিতেছ?···

"সে কহিল, তুমি আলেম লোক। বদি কথার অর্থ জান না? বদি হইল পাপ। তুমি এতদিনে জমানার পাপ হইলে!···

"ক্রুদ্ধভাবে কহিলাম, আমার নাম ওয়াদি-উজ্-জামান। জমানার (কালের) নদী। বাঙ্গালায় ওয়াদি বদিতে পরিণত হইয়াছে। ওয়াদি অর্থ নদী। আমার নামের অর্থ···

"সে বাধা দিয়া পূর্ব্ববৎ হাওয়ার স্বরে কহিল, খামোশ! তুমি কী করিয়াছ, জান না!···

"কী করিয়াছি, তুমিই বলো!···

"ওই লড়কির দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারিবে। উহার চুল, উহার চক্ষু, উহার চাহনি···

"এ কী বলিতেছ?··· ২নি

"বদি-উজ-জামান! তুমি আজ হইতে জমানার বদি। তোমার জন্য সুনিশ্চিত দোজখ!···

"আমি চিৎকার করিয়া উঠিলাম, ফরিদুজ্জামান! তুমি কি সেই কথা বলিবার নিমিত্ত শাদির মজলিশে ঢুকিতে গিয়েছিলে?···

"ছায়া হাওয়ার আওয়াজে হাসিতে২ মিলাইয়া গেল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলাম।···

"ভাবিয়াছিলাম, সাইদাকে এই গোপন তত্ত্ব জানাইব এবং রফিকুজ্জামানকে নির্দেশ জারি করিব জে, জুলেখাকে তালাক দিতে হইবে। কিন্তু ইহার জন্য কী কৈফিয়ত দিব খুঁজিয়া পাই নাই। রফিকুজ্জামান আমার হুকুম তামিল করিবে কি? যদি সে তাহা করে, সাইদা বাধা দিবে। সাইদা ওই লড়কিকে জান দিয়া রক্ষা করিবে। সাইদা আর সে-সাইদা নহে। অধিকন্তু এই গোপনীয় তত্ত্ব শুনিয়া সে আরও হিংস্র হইয়া কলঙ্ক বাধাইতে পারে।···

"পবিত্র কেতাবে বর্ণিত আছে জে, এইপ্রকার গোনাহে সাদ ও গোমরাহ্ নামক দুইটি শহর খোদা জ্বালাইয়া দেন। আমি সেই গোনাহ করিয়াছি সন্দেহ হয়। নাকি নিতান্ত মানসিক ভ্রম?···

"পরদিবস হইতে এবাদতখানায় ইত্তেকাফ লইলাম। সাইদা বিস্মিত হইয়াছিল কি? জানিতে পারি নাই। কালো মশারির ভিতর আত্মগোপন করিয়া রহিলাম। পার্শ্বে সাইদা বা অন্য কেহ আসিয়া খাবার রাখিয়া যাইত। খাইতে পারিতাম না। দুনিয়া আঁধারে ঢাকিয়া যাইতেছিল।···

"কালো মশারির ভিতরে গোপনে ক্রন্দন করিতাম। আমার জন্য এক্ষণে মউত বরাদ্দ হউক। কারণ জিন্দেগীতে ধোকা সৃষ্টি হইলে উহা নিদারুণ ক্ষতস্বরূপ। এক্ষেত্রে মউতই নিষ্কৃতি।···"

জেলা সমাচার পত্রিকার সম্পাদকীয়

'এ যে হরিষে বিষাদ হইল দেখিতেছি! পূর্ব্ব-সংখ্যায় আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠকদিগের জানাইয়াছিলাম যে, কুখ্যাত নরঘাতক দস্যু ছফিজামান ওরফে ছবিলালের ফাঁসির দণ্ড মহামান্য হাইকোর্ট বহাল করিয়াছেন এবং নির্লজ্জ কতিপয় চক্রান্তকারীর সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। গতকল্য নরাধমের ফাঁসিরূপ পুণ্যকর্ম্ম ঘটিলে আমরা আনন্দ-সম্বাদ দিবার নিমিত্ত লেখনী ধারণ করি। কিন্তু ভয়ানক পরিতাপের বিষয়, নগরীর রাজপথে এ কী অদ্ভুত দৃশ্য আমাদিগের দেখিতে বাধ্য করা হইল? দেশে শাসনের নামে দুঃশাসন চলিতেছে, অথবা শাসকবৃন্দের কুস্তকর্ণদশা ঘটিয়াছে; নতুবা ইহা সম্ভব হইত না। আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি যে ওই ছবিলাল বিস্তর কিংবদন্তীর নায়করূপে নিজেকে গ্রাম্য নিরক্ষরদিগের আদিম মানসে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহাও সত্য হওয়া সম্ভব যে, সে জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। তাই বলিয়া ছবিলালের ঘৃণ্য শবদেহে পুষ্প-সজ্জা, শোভাযাত্রা, বিবিধ ধ্বনি-নির্ঘোষ প্রভৃতি ঘটনা কল্পনাও করি নাই। বহুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে চাষাভুষা বন্যপ্রকৃতির লোকসকল আসিয়া এই নগরীতে সমবেত হইল। তাহাদিগের সঙ্গে বহু তথা-কথিত শিক্ষিত(?) ভদ্রলোকবেশী কতিপয় ব্যক্তিকেও দেখা গিয়াছে। আরও দুঃখ ও ঘৃণার কথা, শবদেহের উপর পুষ্প এবং খৈ নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। আমরা উলুধ্বনি ও শঙ্খনাদও শুনিয়াছি বলিয়া ভ্রম হয়। অথবা নির্বোধ স্ত্রীলোকেরা কাহাদের প্ররোচনায় কুখ্যাত নরঘাতককে বীর বলিয়া গণ্য করিল, ইহা বুঝা কঠিন। ইহার মধ্যে মীরজাফর-জয়চাঁদদিগের তৎপরতা অনুমান করা যায়। আশ্চর্য্য, এমন কথাও কেহ-কেহ রটাইতেছে যে, ছবিলালের শবদেহ জীবিত ব্যক্তির ন্যায় কোনও-কোনও স্থলে উঠিয়া দাঁড়ায় এবং মৃদুহাস্যে অভ্যর্থনাগুলিন গ্রহণ করে। দেশে গাঁজা-খোরদের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে বটে! তবে আরও মর্ম্মান্তিক দৃশ্য অবলোকন করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। পুলিশবৃন্দ চিত্রার্পিত বৃক্ষবৎ দণ্ডায়মান ছিল। মাননীয় কালেক্টর বাহাদুরকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, এইরূপ মতিচ্ছন্ন দশার কারণ কী? আমরা শুনিয়াছি, দস্যু ছবিলালের পিতা নাকি মৌলাহাট গ্রামের একজন মুসলমান ধর্ম্মগুরু পীর ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনিও নাকি বিস্তর কেরামতি দেখাইতে সমর্থ ছিলেন। সেইহেতু অনুমান করা চলে, তাঁহারই প্রভাবে প্রভাবিত শিষ্যগণ এই দুষ্কর্ম্মের আয়োজন

করিয়া থাকিবে। ইহা ছাড়া ঘটনার ভিন্ন ব্যাখ্যা হয় না। ধর্মগুরু পীরএক্ষণে জীবিত নহেন শুনিয়াছি। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে তাঁহার প্রভাব ছিল। তবে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া চলে যে, তিনি তাঁহার দস্যু পুত্রকে মৃত গণ্য করিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় আমরা ধন্দে পড়িয়াছি। যে দৃশ্য দেখিলাম, উহার প্রকৃত হেতুগুলিন কী? পরবর্তী সম্বাদে এই রহস্য ফাঁস করিবার আশা রাখি। পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ, তাঁহারা ধৈর্য্য ধরুন। শীঘ্রই দস্যু ছবিলালের শবদেহ লইয়া পৈশাচিক শোভাযাত্রা এবং বিলাপের রহস্য-যবনিকা উন্মোচিত করিব বলিয়া আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রহিলাম।...'

In strange and hidden places thou dost move
Where women cry for torture in their love.
Satan ! at last take pity on our pain.

—Baudelaire

বৃদ্ধা দিলরুখ বেগমের আজকাল হাঁটাচলা করতে কষ্ট হয়। নাতনি কচির বকাঝকায় পাতাকুড়ুনি স্বভাবটি ছাড়তে হয়েছে। অথচ শ্বশুর-হজরতের এবাদতখানার ধ্বংসস্তূপ ও জঙ্গলটিতে তিনি প্রতিদিনই দুপুরবেলা চুপিচুপি যান। নির্জনে বসে থাকেন একটুকরো লাইম-কংক্রিটের চাঙড়ের ওপর। পুকুরের বাঁধানো ঘাটটি ভেঙেচুরে জঙ্গল গজিয়েছে। সেদিকে তাকাতে তাঁর ভয় করে। জলের ভেতর একটা উলটো দুনিয়া আছে। সেই উলটো দুনিয়ার দিকে তাকালে হয়তো সেই উলটো মানুষটিকে দেখে ফেলবেন।

দিলরুখ বেগম জঙ্গলে ঢাকা ধ্বংসস্তূপটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তার সামনে তাঁর শ্বশুর-হজরতের কবর, যেটিকে 'মাজার' বলে লোকেরা। মাজারের উত্তর শিয়রে সেই অজানা দীর্ঘ গাছটির দিকে তাকিয়ে তাঁর গা ছমছম করে। কচি বলেছিল, গাছটির গায়ে হাত রাখলে জ্যান্ত মনে হয়। হয়তো সত্যি। বৃদ্ধ মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে কাঁদেন। এ কান্না অপরাধবোধে। ল্যাংড়া-ভ্যাংড়া এক মানুষ, ওই এবাদতখানায় একা পড়ে থাকতেন। এক সকালে তাঁকে মৃত দেখা গিয়েছিল। সেই মৃত্যু নিয়ে কত গুঞ্জব রটেছিল। হজরত পিরসাহেবকেও কালো মশারির ভেতরে একইভাবে মৃত দেখা গিয়েছিল এবং একইভাবে গুঞ্জব রটেছিল। কালা জিনের হাতে মৃত্যু। সত্যিই কি কালা জিনেরা মানুষকে বাগে পেলে মেরে ফেলে? তাহলে তাঁকে তারা মেরে ফেলছে না কেন? এভাবে তিনি একা এসে বসে থাকেন, সেই কালা জিনেরা তাঁকে মেরে ফেলুক এই ইচ্ছা নিয়ে। সহসা পুবের জঙ্গল থেকে এক দমক হাওয়া আসে। ঝরঝর করে পাতা খসে পড়ে শেষ শীতের গাছপালা থেকে। চমকে ওঠেন, ওরা কি আসছে তাহলে? হাওয়া থেমে যায়। আবার হঠাৎ শুকনো পাতায় খসখস শব্দ। ঘুরে দেখেন একটা কাঠবেড়ালি। অথচ কোনও-কোনও সময় এই জনহীন পারিপার্শ্বিকে ফিসফিস কথা শুনতে পান, কারা কিছু বলতে চায়, যে-ভাষা তিনি বোঝেন না সেই ভাষায়।

দিলরুখ মুখ নামিয়ে বসে থাকেন। এতকাল পরে বুঝতে পারেন, তাঁর অর্ধমানব স্বামী তাঁকে আসলে পরিত্যাগ করেছিলেন। মাথাকোটার মতো করে মনে-মনে বলেন, আমাকে ক্ষমা করো! আমাকে ক্ষমা করো!

...তুমি কি সন্দেহ করেছিলে আমি তোমার ছোটো ভাইয়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলাম? দেখো, ফাঁসির আগে তিনি শুধু আমারই সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন! আমি তো যাই নি! বারিচাচাজি বলেছিলেন, নিজের মুখে সব দোষ কবুল করলে কোন্ আইন দিয়ে তাকে বাঁচাব আমরা? এমন কী, জজ তাকে যখন বললেন, যে-কাজ আপনি করেছেন, তার জন্য আপনি কি অনুতপ্ত? শফি বলল, যা করেছি সজ্ঞানে করেছি। বলল, জজসায়েব! আপনাকেও খুন করতে বড়ো ইচ্ছা, কিন্তু আমার হাতে-পায়ে

ভারি শেকল। আরও সাংঘাতিক কথা, সে থুথু ছুড়ল জজসায়েবের দিকে।

...মওলানা ভাসুরসায়েব ফতোয়া জারি করেছিলেন, শফি হিন্দু ছবিলাল। তার দাফনকাফন হারাম। তার লাস যেন মৌলাহাটে না আসে। খবর পেয়ে হাঙ্গামার ভয়ে বারিচাচাজি দেওরসায়েবের লাস সদর শহরে দাফন-কাফন করেন। উনি চুপিচুপি আমাকে বলেছিলেন, রুকু, তুমি কি কবর-জেয়ারতে (মৃতের জন্য শান্তি-প্রার্থনায়) যেতে চাও? দেখো, আমি যাই নি। শাশুড়িসায়েবা বেঁচে থাকলে হয়তো যেতেন। কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিতে চাইলে আমি যেতাম না। তুমি বিশ্বাস করো, আমি যেতাম না। তাঁকে আমি ঘৃণা করতাম।

বৃদ্ধা মনে-মনে এইসব কথা বলেন। শেষে প্রার্থনার মতো নিজেকে নত করে বলেন, আমাকে মাফ করো! আমাকে মাফ করো! তিনি কখনও ঘাসে শুকনো পাতার স্তূপে বসে অঝোরধারায় কাঁদেন। গোপনে, শব্দহীন ক্রন্দন। সহসা আবার পিছনে খসখস শব্দ হয়। ঘুরে দেখার চেষ্টা করেন। কিন্তু শরীর পাষাণভার। দম আটকে আসে। আর এভাবে এক দুপুরে পারিপার্শ্বিকের চুপিচুপি উচ্চারিত কথাগুলির ভাষা তাঁর বোধগম্য হয়। তিনি স্পষ্ট শুনতে পান শফির কণ্ঠস্বর, রুকু! রুকু! রুকু!

অমনি দিলরুখ বেগম চিৎকার করে ওঠেন, না! তারপর শুকনো পাতার ওপর লুটিয়ে পড়েন।...

উপসংহার

কচি প্রাইভেট পড়ে ফিরে আসছিল। বাজারে ডাকপিওন তাকে একটি পোস্টকার্ড দিল। পোস্টকার্ডটি পড়ে কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইল সে। চিঠিটি লিখেছেন তার বড়ো দাদাজি মওলানা নুরুজ্জামান। বাঙলায় লেখা চিঠি, কিন্তু উরদুতে নামসই। গত বছর ওঁরা সম্পত্তিবিনিময় করে খুলনা চলে গেছেন। যাওয়ার আগে দিল আফরোজ বেগম বোনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। দিলরুখ বেগম যান নি। পরে লোকমারফত খবর আসে, পুবের মাঠের তিনবিঘে জমি দিল আফরোজ বোনের জন্য রেখেছেন। দিলরুখ শক্তমুখে বলেছিলেন, ও জমি হারাম। শ্বশুর-হজরতের হুকুম অমান্য করতে পারব না। কচি গোপনে কামালস্যারের সাহায্যে জমি ভাগচাষে দিয়েছিল। এ বছর সেই ফসলবেচা টাকা সে ডাকঘরে জমা রেখেছে। মাঝে-মাঝে প্রয়োজনে টাকা তোলে এবং দাদিমাকে বলে, সরকারি বৃত্তির টাকা। দাদিমা কিছু টের পান না। সেকেলে মানুষ। পৃথিবীর কোনও খবরই রাখেন না। শুধু স্মৃতির মধ্যে ডুবে থাকেন। স্মৃতির ভেতর থেকে কথা বলেন। কিন্তু এই চিঠিটির খবর কিভাবে দাদিমাকে জানাবে ভেবে পাচ্ছিল না কচি। খুলনায় সম্প্রতি দিল আফরোজ বেগমের মৃত্যু হয়েছে।

বাড়ির কাছে এসে কচি পোস্টকার্ডটি ছিড়ে কুচিকুচি করে ফেলে দিল।

বাড়ির আবরু রক্ষার দেয়ালগুলি ভেঙে পড়েছে। খড়ের চাল সেই জমির খড় দিয়ে মেরামত করিয়েছে কচি। দাদিমাকে জানায় নি এ খড় কোন্ জমির। ভাঙা দেয়ালের ভেতর উঠোন বাইরে থেকে দেখা যায়। কচি থমকে দাঁড়াল। খোকা জলের বালতি থেকে উঠোনে জল ছেটাচ্ছে। অনেকদিন পরে খোকাকে ফিরতে দেখে নয়, ওর কাণ্ড দেখে অবাক হয়েছিল কচি। ছুটে বাড়ি ঢুকে সে আবার থমকে দাঁড়াল।

উঠোন জুড়ে ছাই। চাপচাপ ছাই। খোকা খাপ্পা হয়ে বলল, হঠাৎ এসে না পড়লে কী হত দেখছিস? দাদিমা একেবারে বেহেড, বুঝলি রে? কী সব কাগজপত্তর পুড়িয়েছেন উঠোনে। এসে দেখি, আগুন জ্বগজ্বগ করছে। হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে। একটু হলেই চালে গিয়ে পড়ত, আর ব্যস!

কচি ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর হন্তদন্ত ঘরে ঢুকল। সামনের ঘরের দরজা হাট করে খোলা।

ভেতরে দাদিমা নেই। পাশের ঘরও খোলা। সেখানেও উনি নেই। সে চিৎকার করে ডাকল, দাদিমা!

সাড়া না পেয়ে আবার আগের ঘরে গেল। আবিষ্কার করল, সিন্দুকের ডালা খোলা। ভেতরে হাত ভরে কচি প্রথমে সেই রোজনামচাগুলি খুঁজল, তার সন্দেহ হয়েছিল।

সেগুলি নেই। তার মানে, দাদিমা পুড়িয়ে ফেলেছেন। সে ডাকল, খোকা!

খোকা জবাব দিতে যাচ্ছিল, সেই সময় একটা লোক এসে হন্তদন্ত বলল, খোকামিয়া! এবাদতখানার জঙ্গলে তোমার দাদিজি মরে পড়ে আছেন। শিগগির যাও!

ভাইবোন ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।···

—সমাপ্ত—

চতুরঙ্গ পরবর্তী সংখ্যা

আগামী সংখ্যায় (সেপটেমর) বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত "ধর্ম ও আধুনিক সমাজ" নামে যে বিশেষ প্রবন্ধ ছাপা হবে তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে উল্লেখিত লেখা থেকেই কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হল :

'ধর্ম কেমন করে কলুষিত করতে পারে রাজনীতি, সমাজনীতি তথা সামগ্রিক জীবনধারাকে তার অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায় আমাদেরই দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে। কিন্তু এর জন্য কি ধর্মই প্রকৃতপক্ষে দায়ী, না দায়ী ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং অপব্যবহার? অর্থাৎ পৃথিবীতে ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলেই কি সমস্যার সমাধান হবে, না ধর্ম সম্পর্কে এক যুক্তিবাদী তথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারলে আমরা যথার্থই উপকৃত হব?'

'···আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ যদি ধর্মকে কেবলমাত্র এক প্রয়োজনীয় মনস্তাত্ত্বিক আশ্রয়রূপে স্বীকার করে এবং একের ধর্ম যদি অন্যের ক্ষতি এবং স্বার্থহানির কারণ না হয় তাহলে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের অধিষ্ঠান কোনো আধুনিক যুক্তিতেই আপত্তিকর বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়।'

'সতর্কতার সঙ্গে, আন্তরিকতার সঙ্গে এবং প্রকৃত সত্য সন্ধানের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা যদি বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই তাহলে দেখতে পাব যে সব ধর্মের নির্দেশিত আচার-আচরণের মূল লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন: এই লক্ষ্য ব্যক্তি ও সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা।·····তবে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় আচরণের এই বাস্তব উপযোগিতা সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য হয় না। কাজেই প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য প্রতিটি ধর্মীয় আচারকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যা একমাত্র শ্রমসাধ্য গবেষণার দ্বারাই সম্ভব।'

"··ব্যক্তির মননে কল্পনার ক্রিয়াশীলতা বিজ্ঞান অস্বীকার করতে পারে না। তাছাড়া ধর্ম এক অনন্য কল্পনা এই অর্থে যে এই কল্পনার প্রয়োজনীয়তা প্রতিভাত হয় বিজ্ঞানের ব্যর্থতায়। অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের মোকাবিলায় বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আর ব্যর্থতাই মানুষকে অন্য উৎস থেকে তার প্রয়োজনীয় সাহস আর আত্মবিশ্বাস আহরণে বাধ্য করে এবং এই কারণে বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও আধুনিক পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনও ধর্মে আস্থাশীল। কাজেই বিজ্ঞানের সামুজ্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যত বস্তুবাদীই হোক না কেন, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্তরে নানা ধরনের বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের অস্তিত্বকে অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না। এর অর্থ এই নয় যে, যে মানুষ ধর্মবিশ্বাস ছাড়াই আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারে তাকে ধর্মানুরক্ত করা সামাজিক দায়িত্ব।"

বিদ্যালয়-স্তরে ইংরেজি শেখানো

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

'নতুন কিছু কর্ একটা'

১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বাঙলার স্কুলে "স্ট্রাকচারাল" পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখানো হত। ১৯৮৩ সাল থেকে আচমকা এই পদ্ধতি বাতিল করে "ফাঙশনাল-কমিউনিকেটিভ" পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখানো হচ্ছে।

"স্ট্রাকচারাল" পদ্ধতি অনেক বছর ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে যথেষ্ট গবেষণা-পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। বহু দেশে—ভারতেও—এটি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বিদেশী ভাষা শিক্ষার সুফলদায়ক পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃত এবং অনুসৃত। আমাদের পশ্চিম বাঙলায় এই পদ্ধতি কি কাজ দিচ্ছিল না? —ছাত্রছাত্রীদের কি এই পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখানো যাচ্ছিল না? মধ্যশিক্ষাপর্ষদ কি ২০ বছরের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে, এর ব্যর্থতা বা অকার্যকারিতা বুঝে, এই পদ্ধতিকে বাতিল করলেন? না, তেমন বিশ্লেষণ যে তাঁরা করেছেন, তার কোনো প্রমাণ নেই। তাঁরা কি এ বিষয়ে ইংরেজি-শিক্ষকদের মতামত শুনেছেন, শুনতে চেয়েছেন? না, তারও কোনো প্রমাণ নেই। এই যে হঠাৎ আনকোরা নতুন "ফাঙশনাল-কমিউনিকেটিভ" পদ্ধতি গ্রহণ করা হল, মধ্যশিক্ষা-পর্ষদ কি তার আগে চিন্তা করে দেখেছেন—এই পদ্ধতিকে কার্যকর করে তোলার মতো প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে কিনা? এই রাজ্যের সীমিত আর্থিক সামর্থ্যে এই পরিকাঠামো আদৌ গড়ে-তোলা সম্ভব কিনা? সে চিন্তা যে তাঁরা কখনও করেছেন, তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। বরং শোনা গেছে, কিছু-কিছু শিক্ষাবিদ্ হঠাৎ এই পদ্ধতি অনুসরণ করার বিপদ সম্বন্ধে পর্ষদকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কিছু গঠনমূলক প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। সেসব হয়েছে অরণ্যে রোদন।

আগেকার কথা

ব্রিটিশ আমল থেকেই এদেশে ইংরেজির চর্চা চলে আসছে। উপনিবেশ-ভারতে অনেকটা প্রথম ভাষার মর্যাদা দিয়ে ইংরেজি শেখানো হত—মাতৃভাষার স্থান ছিল ইংরেজির নীচে। পরীক্ষায় ইংরেজির জন্যে বরাদ্দ ছিল ২০০ নম্বর, মাতৃভাষার জন্যে ১০০। প্রথমে ইংরেজির পরীক্ষা হত, পরে মাতৃভাষার। তখন চালু ছিল "অনুবাদ" পদ্ধতি। এই বিশাল উপমহাদেশের যে অতি-অল্পসংখ্যক ছাত্র (এবং নগণ্যসংখ্যক ছাত্রী) তখন ইংরেজি পড়ার সুযোগ পেত (বা নিত), তারা কতটা ভালোভাবে ইংরেজি শিখত (বা ব্যবহার করতে পারত), এখানে সে প্রসঙ্গে যাবার দরকার নেই।

স্বাধীনতার পরে এই সমস্ত বিষয়টা নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হল। যেসব প্রশ্ন তখন শিক্ষাব্রতীদের আলোচনায় এল সেগুলি এই: (১) স্কুলে ভাষাশিক্ষায় ইংরেজির স্থান কোথায়? (২) কখন থেকে ইংরেজি পড়ানো শুরু করতে হবে?—প্রাথমিক স্তর থেকে, না মাধ্যমিক স্তর থেকে? (৩) কোন্ পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখানো হবে? (৪) লক্ষ্যটা কী হবে? অর্থাৎ, মাধ্যমিক স্তরের শেষে ছাত্রছাত্রীদের এই ভাষায় পারদর্শিতার কোন্ স্তরে পৌঁছে দিতে হবে?

ইংরেজি আন্তর্জাতিক সংযোগের প্রধানতম ভাষা, তাই ইংরেজির চর্চা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে; তবে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে এ ভাষার স্থান দ্বিতীয়, মাতৃভাষার পরে—এ সিদ্ধান্ত ছিল সর্বসম্মত।

কোন্ স্তর থেকে?

গ্রামাঞ্চলের কথা ছেড়ে দিলে (প্রাক্-স্বাধীনতা কালে বা স্বাধীনতার পরে-পরেই গ্রামাঞ্চলে স্কুল কটিই বা ছিল?) এই প্রদেশে/রাজ্যে বহুকাল থেকে একেবারে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেই ইংরেজি পড়ানো হত—"অনুবাদ" পদ্ধতিতে। পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি রাজ্যের শিক্ষাবিভাগ থেকে নির্দেশ এল—পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়াতে হবে (অর্থাৎ, প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রমে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে কেবল মাতৃভাষা)। বছর পাঁচ-ছয় পরে এ সিদ্ধান্ত নাকচ করে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি-শেখানো শুরু করতে বলা হল। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বহাল ছিল। ১৯৮১-র শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক স্তরে (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) কেবল একটি ভাষাই শেখানো হচ্ছে—সেটি মাতৃভাষা। ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যেই এখন প্রাথমিক স্তরে কেবল মাতৃভাষাই শেখানো হয়। বলা যায়, এটি এখন জাতীয় নীতি।

সর্বাধুনিক-বিজ্ঞানসম্মত ভাষাশিক্ষানীতির সঙ্গে এই নীতির সংগতি আছে। কোঠারি কমিশন এই নীতির সপক্ষে, পশ্চিম বাঙলায় প্রাথমিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিত রচনা এবং নীতি নির্ধারণের জন্য ১৯৭৪ সালে যে কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল, তাঁরাই এই নীতির নির্দেশ দেন। এই রাজ্যে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি শেখানো হচ্ছে মাধ্যমিক স্তরের সর্বনিম্ন পর্যায় ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে।

শিক্ষক আর অভিভাবকদের মধ্যে এই নীতির সমর্থকের সংখ্যা কম নয়, আবার প্রতিবাদী কণ্ঠও জোরালো। সমর্থকেরা বলেন, একটু বেশি বয়সে নতুন ভাষা শিখলে সেটা আয়ত্ত হয় খুব দ্রুত আর ভালোভাবে। কারণ, পাঁচটি বছর কথিত আর লিখিত মাতৃভাষা ক্রমাগত চর্চার ফলে ভাষা-ব্যাপারটির প্রক্রিয়া-প্রকরণ সম্বন্ধে বিদ্যার্থীদের একটি ধারণা গড়ে ওঠে। এশিয়া-আফ্রিকা-ইউরোপ-আমেরিকার অনেক দেশে এই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে, এটা সার্বিক সত্য। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজি শিখেছিলেন "বিদ্যাসাগর" হবার ন বছর পর—মাত্র ৩০ বছর বয়সে।

এই মতের বিরোধী পক্ষের যুক্তি: ভালো করে ইংরেজি শেখার পক্ষে পাঁচ বছর খুবই কম সময়। (ভালো করে ইংরেজি শেখা বলতে কী বোঝায়, সে সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়; এক-এক জনের এক-এক রকম বিশ্বাস বা ধারণা।) আর এখন আচমকা যে পদ্ধতি চালু হয়েছে, তাতে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো একেবারেই অসম্ভব। কুড়ি বছর ইংরেজি শেখাচ্ছেন, এমন এক শিক্ষকের অভিমত: 'ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজি পড়ানো আরম্ভ করলে মধ্যশিক্ষা-পর্ষদের নির্দিষ্ট মানে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব। অষ্টম শ্রেণীতে যে-ধরনে 'কম্পোজিশন' লিখতে দেওয়া হবে, তা 'আপহিল টাস্ক'। ষষ্ঠ শ্রেণীতে এ বি সি ডি পড়া শুরু করে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী কেমন করে লিখবে এর উত্তর?—'Suppose, you are passing along a road. A boy is run over by a bus. In your letter to your friend, describe the scene you have seen.'

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১.১.৮৭)

অনেক প্রতিবাদী প্রাথমিক শিক্ষক শিশুদের কল্যাণচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণী থেকেই ইংরেজি পড়াচ্ছেন। এঁরা ইংরেজি পড়াতে শিখেছেন কিনা, এ প্রশ্ন এঁদের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা করেন কি? জানা যায় নি।

পদ্ধতির প্রশ্ন

কোন্ স্তর থেকে—এই প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত সমাধান হয়ে গেলে, যে প্রশ্নটি সামনে এসে দাঁড়ায় তা হচ্ছে পদ্ধতির প্রশ্ন। এটি একটি গুরুতর প্রশ্ন। পদ্ধতি সঠিক না হলে ইংরেজি শেখানোর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

১৯৬২ সাল পর্যন্ত এদেশে সাধারণত যে পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখানো হয়েছে তাকে বলা হয় ট্রানস্লেশন পদ্ধতি। এটি এখন বর্জিত।

ইংরেজি যাদের পরভাষা, তাদের ইংরেজি শেখানোর ফলদায়ক পদ্ধতি কী, ১৯৩৯-৪০ সাল থেকে ইংল্যান্ডে এবং অন্যান্য দেশে এই প্রশ্নের সমাধানে চিন্তাভাবনা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। এরই মধ্য থেকে বিবর্তিত হয় "স্ট্রাকচারাল মেথড"।

এই পদ্ধতির মূলনীতিটি হল: শিশু যে প্রক্রিয়ায় মাতৃভাষা শেখে ঠিক সেই প্রক্রিয়াতেই বিদেশী ভাষা শিখতে পারে ভালো। প্রক্রিয়াটি হল: বার-বার শোনা, শুনতে-শুনতে বলা। এ দুটি প্রাথমিক ধাপ। তৃতীয় ধাপে পড়া, শেষ ধাপে লেখা।

শুনে-শুনে নানান গড়নের বাক্য সাবলীলভাবে বলার অভ্যাস যখন আয়ত্ত হবে, সচ্ছন্দে পড়ার ক্ষমতা বেশ বাড়বে, তখনই বিভিন্ন বাক্যে পদগুলির আন্তঃসম্পর্ক বোঝানোর জন্য ব্যাকরণ শেখানো হবে—তার আগে নয়। (আর, সে ব্যাকরণ রো এবং ওয়েব বা নেসফিল্ডের ব্যাকরণ নয়।)

এই "স্ট্রাকচারাল মেথড" সুফলদায়ক পদ্ধতি হিসাবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, এবং অনুসৃত হচ্ছে বহু দেশে। এখনও সারা ভারতে এই পদ্ধতিতেই ইংরেজি শেখানো হয় (পশ্চিম বাঙলা একক ব্যতিক্রম)।

মধ্যশিক্ষাপর্ষদের পরিকল্পনাহীন আধাখ্যাঁচড়া কাজ

পশ্চিম বাঙলায় স্ট্রাকচারাল পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় ১৯৬৩ সালে, প্রচলিত থাকে ১৯৮২ পর্যন্ত।

কেমন এলোমেলোভাবে প্রবর্তিত হল দেখা যাক।

১৯৬৩ সালেই অর্থাৎ একই শিক্ষাবর্ষে একসঙ্গে ৩য়, ৪র্থ আর ৫ম—এই তিন শ্রেণীর বই প্রকাশ করে দেওয়া হল।

সুদীর্ঘ কাল অনুবাদ-পদ্ধতিতে পড়াতে অভ্যস্ত শিক্ষকদের কোনো প্রশিক্ষণ দেওয়া হল না—মাত্র ৫০০ বুকলেট ছাপিয়ে কর্তব্য সমাধা করে এই নতুন পদ্ধতি একই সঙ্গে তিন শ্রেণীতে চালু করা হল। এই স্ট্রাকচারাল পদ্ধতিতে অনুবাদের স্থান নেই। ব্যাকরণের

বই থাকতে পারে—কিন্তু তা অন্য ধাঁচে লেখা হতে হবে। এইভাবে অপ্রস্তুত অবস্থায় তাড়াহুড়ো করে শুরু করে দেওয়ার ফল কী দাঁড়াল? শিক্ষকেরা ঠিকমতো প্রশিক্ষণ না পাওয়াতে বেশির-ভাগ স্কুলে পুরনো অনুবাদ-পদ্ধতিতেই স্ট্রাকচারাল পদ্ধতির বই পড়ানো হতে লাগল। অর্থাৎ, কার্যত এই পদ্ধতি অব্যবহৃতই থেকে গেল।

আরও অসংগতি দেখা গেল এ রাজ্যের মধ্যশিক্ষা-পর্ষদের কাজে—অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বই লেখানো হল স্ট্রাকচারাল পদ্ধতিতে, আর নবম-দশম শ্রেণীতে চলতে থাকল সেই সনাতন পদ্ধতি।

এই স্ট্রাকচারাল পদ্ধতি যদি নিয়মমতো অনুসরণ করা হত, তাহলে এর সুফলগুলি স্পষ্ট দেখা যেত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষদ তা তো হতে দিলেন না। যেখানে তা হতে দেওয়া হয়েছে, যা-যা করার সেসব ঠিকমতো করা হয়েছে, প্রয়োজনীয় সংখ্যায় প্রশিক্ষিত শিক্ষক তৈরি করা হয়েছে, সেখানে ভালো ফল পাওয়া গেছে। উজ্জ্বলতম উদাহরণ—তামিলনাড়ু।

স্ট্রাকচারাল পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করে ইংরেজি শেখাতে হলে এ রাজ্যে ৬ষ্ঠ-১০ম পাঁচ শ্রেণীর জন্য অন্তত ২৪-২৫ হাজার প্রশিক্ষিত ইংরেজি-শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু এখন আছেন, বাড়িয়ে ধরলেও, পাঁচ হাজার।

এইসব ঘটনা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়: পশ্চিম বাঙলায় স্ট্রাকচারাল পদ্ধতি চালু থেকেও চালু হয় নি। কুড়ি বছর ধরে পর্ষদ-কর্তৃপক্ষের কর্তব্যচ্যুতির কারণে কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রী ভালোভাবে ইংরেজি শিখতে পারল না।

সমস্যাটা ছিল সুচিন্তিত প্রয়োগের

স্ট্রাকচারাল পদ্ধতিকে ঠিকমতো প্রয়োগ করতে গেলে প্রথমেই যেটির দরকার ছিল সেটি হল প্রশিক্ষিত ইংরেজি-শিক্ষকের সংখ্যা প্রয়োজনমতো বাড়ানো—যাতে এই পদ্ধতি সর্বত্র যথাযথভাবে অনুসরণ করা যায়। উচিত ছিল—মাঝে-মাঝেই কাজের পর্যালোচনা করা, স্কুলগুলোতে পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ হচ্ছে কিনা দেখার জন্য কার্যকর গাইড কমিটি নিয়োগ করা। উচিত ছিল—প্রত্যেক জেলায়, বড়ো-বড়ো মহকুমায় তিন-চার মাসের প্রশিক্ষণকেন্দ্র খুলে দেওয়া, যাতে একটি নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে প্রত্যেক স্কুলে অন্তত একজন করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইংরেজি-শিক্ষক থাকেন।

মফসল-শহরে বা দূর-গ্রামে (কলকাতার বেশ কয়েকটি মেয়েদের বিদ্যালয়েও) অনেক স্কুলে বাঙলা বা ইতিহাস বা গণিতের শিক্ষকই ইংরেজি পড়ান (ইংরেজির শিক্ষক নেই বলে)। এক্ষেত্রে—যখন প্রশিক্ষিত ইংরেজি-শিক্ষকের এতই অভাব—এঁদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কোনো সমস্যাই সমাধানের অতীত ছিল না।

ভুষলকি সংস্কার

এ রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষার বিধায়কেরা কিন্তু এভাবে সমাধানের পথে গেলেন না। তাঁরা ধুয়ো তুললেন: স্ট্রাকচারাল পদ্ধতিতে ইংরেজি ভালো শেখা যায় না। ত্রুটি পদ্ধতির না প্রয়োগের—তা তাঁরা খুঁটিয়ে দেখতে চাইলেন না। তাঁরা দেশের বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থাও বুঝে দেখতে অস্বীকার করলেন। অন্ধ জেদের বশীভূত হয়ে তাঁরা ১৯৮৩ সাল থেকে এমন একটা পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন যেটি

(ক) ভারতের আর-কোনো রাজ্যে এখনও গৃহীত হয় নি; (খ) যেটির কার্যকারিতা এখনও ব্যাপকভাবে বাস্তব প্রয়োগের দ্বারা পরীক্ষিত হয় নি; (গ) এবং, সবচেয়ে বড়ো কথা, এই পদ্ধতি প্রচলনের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এখন এ রাজ্যে নেই।

"ফাঙশনাল কমিউনিকেটিভ" পদ্ধতিতে ভালোভাবে ইংরেজি শেখানো যায় না—এ কথা আমরা

আদৌ বলতে চাইছি না। বস্তুত, এই পদ্ধতির একটা যুক্তিগ্রাহ্য তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল: এই পদ্ধতিকে সঠিকভাবে প্রয়োগের আর্থিক সামর্থ্য পশ্চিম বাঙলার এই মুহূর্তে আছে কি? নিশ্চয়ই নেই। তাই, স্ট্রাকচারাল পদ্ধতি নিয়ে যেমন ছেলেখেলা হয়েছে, এই পদ্ধতি নিয়েও তাই-ই হচ্ছে। এক্ষেত্রেও দায়িত্ববোধের অমার্জনীয় অভাব দেখা যাচ্ছে।

"ফাঙশনাল-কমিউনিকেটিভ" পদ্ধতির সফল প্রয়োগের জন্য চাই: খুব বেশি হলে ২০-২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ছোটো-ছোটো ক্লাস। তার অর্থ—অন্তত ৫০ হাজার প্রশিক্ষিত ইংরেজি-শিক্ষক; তার অর্থ—আরও বেশি ক্লাস-ঘর; তার অর্থ—আরও বেশি মাধ্যমিক স্কুল—কারণ বিদ্যমান স্কুলগুলির অনেকেরই স্থানাভাবে আর বিস্তারের সম্ভাবনা নেই।

শহরে-শহরে ব্যাপক হারে দ্রুত তালে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের ব্যয়, নতুন ক্লাসঘর তৈরির ব্যয়, নতুন-নতুন স্কুলবাড়ি নির্মাণের ব্যয়—বেশ কয়েক কোটি টাকার অল্পমেয়াদি বাজেট। পশ্চিম বাঙলার মাধ্যমিক স্তরে শুধু ভালোভাবে ইংরেজি শেখানোর জন্য তিন-চার-পাঁচ বছরে এত কোটি-কোটি টাকার সংস্থান করা সম্ভব কি? আদৌ নয়।

বাস্তব চিত্রটি কেমন?

কয়েকটি ভালো স্কুলের কথা বাদ দিলে, কি শহরের কি গ্রামের স্কুলগুলোর বাস্তব অবস্থা কী, শিক্ষকরা এই পদ্ধতিতে পড়াতে গিয়ে কী কী অসুবিধা বোধ করছেন, অভিভাবকরাই বা কী ভাবছেন এই পদ্ধতি সম্পর্কে—এগুলো জানতে পারলে বাস্তব চিত্রটি স্পষ্ট ফুটে উঠবে।

(১) বেশির-ভাগ স্কুলে এক-একটা ক্লাসে ৭০ থেকে ৯০ জন ছাত্র। শেখানোর সময় মাত্র ৪০ মিনিট। ছাত্রছাত্রীরা আসছে ভিন্ন-ভিন্ন পরিবেশ থেকে। সেখানে কিভাবে তারা ইংরেজিতে কথোপকথন করবে, আর কিভাবেই বা ড্রিল বা গ্রুপ ওয়ার্ক করবে? —বেনচি সরাতে-সরাতেই ইংরেজির পিরিয়ড শেষ।

কলকাতার এক সরকারি স্কুলের শিক্ষকের কথা: 'আমি একদিনে তিনটে করে পিরিয়ড পাই। এক-একটি পিরিয়ডের সময়সীমা ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট; ছাত্রসংখ্যা ৪৫ থেকে ৫০। কী করে আমি এদের ইনডিভিজুয়াল কেয়ার নেব, আবার এর মধ্যেই কপি-বুক চেক করতে হবে—কী করে করব? এটা তো অসম্ভব। দশ থেকে পনেরোটি ছেলে পেলে শেখানোটা খুব সহজ হত, কিন্তু সেটা তো অসম্ভব।'

(২) ওইটুকু সময়ের মধ্যে শিক্ষকেরা অত ছাত্রকে শেখাতে পারছেন না, আবার এই পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাও শিখতে পারছে না। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা তো বাড়ির সাহায্য পায়ই না। শহরের অভিভাবকরাও তাঁদের সন্তানদের প্রয়োজনমতো সাহায্য করতে পারেন না, কেননা এই মেথড তাঁদেরও অচেনা-অজানা। পর্ষদ বলছেন, বাড়িতে পড়ানোর দরকারই হবে না—স্কুলেই তারা শিখে নিতে পারবে। কিন্তু পারছে কি? অভিজ্ঞতা বলছে—না।

কলকাতা শহরের একটি নামকরা স্কুলের শিক্ষক মহাশয় বললেন, 'গার্ডিয়ানেরা শেখান পুরোনো পদ্ধতিতে আর আমরা স্কুলে নতুন মেথড অ্যাপ্লাই করছি। তার ফলে একটা বড়ো সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ৪০ মিনিট করে সপ্তাহে মাত্র আটটা ক্লাস পাওয়া যায়—এতগুলি ছাত্র, ইংরেজির মতো এমন সমৃদ্ধিশালী ভাষা এই সময়ের মধ্যে শেখানো যায় কি? তাই বাড়িতে তো পড়তেই হবে—সেখানেই দ্বন্দ্বটা দেখা দিচ্ছে।'

সব মাটিতে সব ফসল ভালো জন্মায় না

তিনি আরও বললেন, 'আমার স্কুলের সমস্যা তো সমস্যা নয়, যে-কোনো মেথডেই আমার ছেলেরা

ভালো ফল করবে—আমরা মোটামুটি ভালো মানের ছাত্র পাই। গ্রাম দিয়ে বোঝা যাবে মেথডটা কতটা বিজ্ঞানসম্মত। তবে একটা কথা সবারই মাথায় রাখতে হবে—"সব মাটিতে সব ফসল ভালো জন্মায় না"। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নীতি আর পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হয়।'

কলকাতারই আর-একজন শিক্ষকের অভিমত (যিনি সচেতনভাবে ছাত্রদের কথা ভাবেন, পদ্ধতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন): 'এ পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত, তবু অনেক প্রশ্ন আছে শিক্ষক আর অভিভাবকদের মধ্যে। সেগুলোর সবটাই অন্যায় বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়, ভিত্তিহীনও নয়। যে ছাত্র ক্লাস সিকস-এ শুরু করেছে সে ক্লাস সেভন-এ এসে কতটা অগ্রগতি করল সেটা কাউকে তত্ত্ব দিয়ে বোঝাতে হয় না, যে-কেউ সেটা বুঝতে পারে। সবক্ষেত্রে না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যদি অগ্রগতি লক্ষ করা যেত তাহলে নিশ্চয়ই কারো ক্ষোভ থাকত না।

'ওরিয়েনটেশনের ব্যবস্থা কম হলেও বেশ-কিছু শিক্ষক ওরিয়েনটেশন নিয়েছেন। তাঁদের কাজে লাগানোর কথা, কিন্তু তা হচ্ছে না। ওরিয়েনটেশন-নেওয়া শিক্ষকদের সঙ্গে ওপরমহলের কারো কোনো যোগাযোগ নেই। তাঁরা কী সুবিধে বা অসুবিধে বোধ করছেন এটা খোলাখুলি জানাবার কোনো ব্যবস্থা নেই।

'ছাত্রদের বলা হয়েছে "নোটবই পোড়ো না", কিন্তু ছাত্ররা নোটবই ছাড়া বই কিনতে পাচ্ছে না। যা পড়ানো হচ্ছে তাতে যে ছেলেটি নোটবই পড়ে সে-ই বেশি এগিয়ে যাচ্ছে। সাধারণভাবে ছাত্রদের ক্ষতি হচ্ছে, তাদের শ্রদ্ধাও নষ্ট হচ্ছে।

'কলকাতার নামকরা স্কুলগুলোতে টীচিঙ আর ইভ্যালুয়েশন—এই উভয় ক্ষেত্রেই যা হওয়া উচিত আর যা হচ্ছে তাতে বিস্তর ফারাক। বিভিন্ন স্কুলে খোঁজ নিলে দেখবেন, এক-এক স্কুলে এক-এক রকম। আমাদের স্কুলে আমরা যত নমবরে ওয়্যাল পরীক্ষা নিচ্ছি, এবং যা নির্দেশ দেওয়া আছে, আমার মেয়ের স্কুলে বা আমার পাড়ায় অন্য যেসব ছাত্র আছে তাদের স্কুলে মোটেই তা হচ্ছে না। ক্লাস নেওয়ার পদ্ধতি, পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতি—তাতেও ঢের তফাত। অথচ ওইসব স্কুল বেশ নামকরা। আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি না এর ফল অবশ্যই ভালো হবে।

'এ ছাড়াও আরেকটা দিক আছে যেটা মোটেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। চান বা না চান, কলকাতায় বা সব জায়গাতেই দু সারির স্কুল আছে। প্রথম সারির স্কুলগুলোতে এ সমস্যা ততটা প্রকট নয় যতটা দ্বিতীয় সারির স্কুলগুলোতে। এই সিলেবাস ক্লাসের পার-ফরমেনসের ওপর নির্ভর করে—এটা ঠিক। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে-পড়া ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হল, এরা যত বড়ো হতে থাকে ততই বেশি করে পরিবারের জন্য নানা কাজকর্মে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়; পড়াশুনার জন্য এদের সময় আর সুযোগ কমে আসতে থাকে—নিয়মিত ক্লাসে আসতে পারে না। বিশেষত, এরা ক্লাসের বাইরে যে পরিবেশ বা পরিস্থিতির মধ্যে থাকে তাতে স্ট্রাকচারাল মেথডে তবুও যেটুকু কাজ চালিয়ে নিতে পারত, এখন সেটা পারছে না। অনেক স্কুল-শিক্ষকেরই যেখানে এই মেথড সম্বন্ধে বহু বিভ্রান্তি রয়েছে সেখানে যে-কোনো একজন কলেজের ছাত্র প্রাইভেট টিউটর হিসেবে বা বাড়ির বা পাড়ার অন্য কেউ তার সাহায্যে মোটেই এগিয়ে আসতে পারে না। ফলে এরা ক্রমশই পিছিয়ে পড়ে।

'সবশেষে একটা কথা বলতেই হচ্ছে। গত বছর একটা স্যাম্পল টেসট নেওয়া হয়েছিল এই [ইংরেজি] সিলেবাসের সঙ্গে এর আগের সিলেবাসের একটা তুলনামূলক বিচারের জন্য। সেটার ফলাফল জানার জন্য আগ্রহী হলে শিক্ষক, অভিভাবক বা ছাত্রদের ক্ষেত্রে সেটা নিশ্চয়ই অপরাধ বলে গণ্য হবে না।'

(৩) গ্রাম কেন, মফসসল এবং খোদ কলকাতা শহরেই দেখা গেছে, অন্য বিষয়ের শিক্ষক ইংরেজি

পড়ান। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের প্রশিক্ষণ থাকে না। এই পদ্ধতিতে পড়ানোর জন্য ইংরেজিতে যতটা জ্ঞান থাকা দরকার ততটা তাঁদের নেই (সেটা তাঁদের দোষ নয়)—বিশেষ করে ভোক্যাবুলারিতে। তাঁরা কী করে পড়াবেন?

একটি হিন্দি-মাধ্যম স্কুলের শিক্ষকদের বক্তব্য: 'সরকার বা পর্ষদ একটা মেথড চালু করলেন পুরনো মেথডটাকে বাতিল করে। কিন্তু কেন? ইংরেজি ভালো করে শেখাবে বলে, না, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবে না বলে? এত খরচ করে একটা মেথড চালু করল, অথচ সেই টাকায় তো কিছু শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে পারত, কিছু সেকশন খুলতে পারত। আমাদের স্কুলে এক-একটা ক্লাসে ১০০ করে ছাত্র। পর্ষদ এ খবর রাখেন কি? কী দিয়ে প্রমাণ হল এই মেথড খুব কার্যকর? কয়েকটা ছাত্রকে তোতাপাখির মতো শিখিয়ে-পড়িয়ে ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে গেলেন, আর তাতেই প্রমাণ হল এটা ঠিক? আমাদের এই পরিবেশে যেখানে বেশির-ভাগ ছাত্রই আসে লোয়ার মিডল ক্লাস থেকে সেখানে কী করে এই মেথড ফলো করা যায়? বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে যতই চেঁচাক, আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থায় এই মেথড কার্যকর নয়।'

গ্রামের শিক্ষার্থীদের অবস্থা আরও সমস্যাসঙ্কুল। ওখানে ছাত্ররা আসে ধনী কৃষক, মধ্য কৃষক আর ভূমিহীন কৃষকের ঘর থেকে (শেষোক্ত পরিবার থেকে, সংখ্যায় খুব কম হলেও, আজকাল ছাত্র আসছে)। ওই ছাত্রদের মা-বাবা পড়াশুনা (বইপড়া) করেন নি বললেই চলে। তাদের একটা আলাদা পরিবেশ; ওই পরিবেশ থেকে এসে এই পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখা একেবারে অসম্ভব। লেসন্‌গুলো গ্রামের ক্ষেত্রে জীবন-সম্পৃক্ত নয় বলে ছাত্ররা প্রাণ পাচ্ছে না। কি মেয়েদের স্কুল, কি ছেলেদের স্কুল—সব স্কুলের শিক্ষকরাই বললেন, 'এই মেথড তৈরি হয়েছে কলকাতায় বসে সেখানকার বড়োলোকদের ছেলেমেয়েদের জন্য—আমাদের ছেলেমেয়েদের কথা ভাবা হয় নি। হলে, স্ট্রাকচারাল মেথডটাকেই রেখে দিতেন অধিকর্তারা। কারণ, স্ট্রাকচারাল মেথড তো অবৈজ্ঞানিক নয়! নতুন কিছু করব—এই ধারণা থেকেই এটা করা। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কী তা কেউ বিচার করল না। নতুন জিনিস ভালো, কিন্তু নতুনের নাম করে উদ্ভট জিনিসটা মোটেই ভালো নয়। এর ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।'···'আমাদের এক-একটা ক্লাসে ৭০ থেকে ১০০-র মতো ছাত্র। ভাবা যায়—এই এতগুলো ছেলেকে ইনডিভিজুয়াল ট্রেনিং দেব কী করে। আর আমরা কোনো ওরিয়েন-টেশন নিই নি। সবাই দেখছে—গ্রামে স্কুল হয়েছে, ছেলেমেয়ে আসছে। আসছে তো, কিন্তু কিছু হচ্ছে কি? সরকার পরিমাণের দিকটাই চিন্তা করছেন, গুণগত দিকটা দেখছেন না।'

কতটা শেখাতে চাইছি?

বর্ধমানের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা অন্যান্য গ্রাম-ভিত্তিক জেলার থেকে ভালো। খোদ বর্ধমান শহরের এক প্রসিদ্ধ স্কুলের কোনো শিক্ষকের বক্তব্য: 'আসলে কতটা ইংরেজির জ্ঞান মাধ্যমিক স্তরে পর্ষদ চাইছেন, তা-ই পরিষ্কার নয়। এত দিন পর্যন্ত যে পর্যন্ত [মাধ্যমিক] স্তর ভাবা হত, এখনকার পর্ষদ-শিক্ষা-বিদরা তাতে সন্তুষ্ট নন—তার থেকেও উঁচু আশা করছেন। ফলে, নবম শ্রেণীতে এমন সব আর্টিকল্ দিয়েছেন যাদের ছুঁতে হলে ছাত্রছাত্রীদের এমন এক সমাজে থাকতে হবে যেখানে ইংরেজি ভাষা রোজ বেশ কিছুক্ষণ কানে শুনতে আর মুখে বলতে বাধ্য হতে হয়।'

এক প্রবীণ, অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদের মন্তব্য এইরকম: 'স্ট্রাকচারাল পদ্ধতি যেখানে ঠিকমতো চালু করা হল না, সেখানে হঠাৎ কেন এক নতুন পদ্ধতি চালু করা হল—এটা বুদ্ধির অগম্য। কুড়ি বছরে ছাত্রছাত্রীরা

কী শিখল? যা ভাবা হয়েছিল তা যদি না হয়ে থাকে, কেন হল না? এসব পর্যালোচনা না করেই হুম করে নতুনের আবির্ভাব। যেখানে যেমন পরিবেশ, সেখানে তার উপযোগী পদ্ধতি গ্রহণ করা ভালো। ভারতবর্ষের সামগ্রিক পরিবেশের বাইরে পশ্চিম বাঙলা নয়। সব রাজ্যে একরকম, পশ্চিম বাঙলায় আর-একরকম! ভারতভিত্তিক পরীক্ষার সময় সংখ্যা-গরিষ্ঠরা প্রাধান্য পাবে, সেখানে আমাদের ছেলে-মেয়েরা কী করবে?

'এই পদ্ধতিতে যে ইংরেজি আছে তাতে মাধ্যমিক স্তরে গ্র্যাজুয়েশন কোর্স্ চালু করে দিতে চাইছেন। আপনারা এর পর কোনো দিন শুনবেন, দশম শ্রেণীর অঙ্ক সপ্তম শ্রেণীতে চলে এসেছে। আমাদের মস্তিষ্কের যে ক্রমবিকাশ ঘটে, নতুন ধারা চালু করতে গিয়ে সেই সত্যটা এঁরা ভুলে গেছেন।

'অ্যামবিশাস প্ল্যান হয়ে গেছে। একটা আইডিয়া ভালো হলেই হবে না, যে পরিবেশে তাকে ইমপ্লি-মেন্ট্ করা হচ্ছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা চাই। কয়েক বছর বাদে আবার আর-এক ধারায় ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শেখানোর চেষ্টা হবে। কেন না, কোনো প্রয়োগের ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা থাকছে না। ফলে ছাত্রসমাজ গিনিপিগে পরিণত হচ্ছে। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। যে-সমস্ত স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা আসছে নিম্ন অর্থনৈতিক শ্রেণী থেকে, তাদের কী অবস্থা হচ্ছে পর্যালোচনা করুন, দেখবেন চাকা কোন্ দিকে ঘুরছে।

'বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদরা নাকি এর সঙ্গে যুক্ত! যুক্ত কিনা জানি না, তবে তাঁরা যে আমাদের দেশের সামগ্রিক শিক্ষার বিকাশ সম্বন্ধে অনাগ্রহী, নিরুত্তাপ —সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। যে ভাবে যে জিনিস চালু করা হল, ইউরোপের দেশ হলে প্রতিবাদের ঝড় উঠে যেত। আমাদের দেশে নিরক্ষরের শতকরা হার এত বেশি বলেই বোধহয় এসব ঝড়-টড় ওঠে না।'

শিক্ষাবিধাতারা নতুন কিছু করার মোহে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে "ফাঙশনাল-কমিউনিকেটিভ" পদ্ধতি চালিয়ে দিলেন। এর অস্তিত্ব রক্ষা করতে গেলে কতকগুলি অত্যাবশ্যক চাহিদা পূরণ করতে হবে। প্রথমত চাই, কয়েক হাজার প্রশিক্ষিত ইংরেজি-শিক্ষক। দ্বিতীয়ত চাই, কয়েক শ নতুন স্কুল। তাতে একসঙ্গে ২০-২৫ জনকে ইংরেজি শেখানোর জন্য ছোটো-ছোটো ঘর। পড়ানোর সাজসরঞ্জাম কিনতে হবে কয়েক কোটি টাকার। একবার কিনলে হবে না—ভেরিয়ে-শনের জন্য প্রায় প্রতি বছর কিনতে হবে। প্রত্যেক স্কুলে অন্ততপক্ষে "ইংলিশ ল্যাবরেটরি" নামে ঘর রাখতে হবে। একই শব্দ যাতে একইভাবে ঠিকমতো উচ্চারিত হয় তার জন্য ক্যাসেটের ব্যবস্থা প্রতিটি স্কুলে রাখতে হবে।

প্রতি বছর চার লাখ করে ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। তাহলে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কমপক্ষে ২০ লাখ ছাত্রছাত্রী ইংরেজি শিখছে। ২০-২৫ জনের জন্য একজন করে শিক্ষক চাই। তাহলে কত জন প্রশিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন? অন্তত ২৩-২৪ হাজার।

বেশ কয়েক বছর ধরে এই রাজ্যকে কোটি-কোটি টাকা খরচ করতে হবে শুধু ইংরেজি শেখানোর জন্য। কোথা থেকে আসবে এই টাকা?

স্পষ্টতই, রাজ্য সরকারের এত টাকা দেবার সংগতি নেই। নেই বলেই এই পদ্ধতি বজায় রাখা সম্ভব নয়। জেদের বশে জোর করে বজায় রাখতে গেলে সমস্যার পর সমস্যা দেখা দেবে, আর শেষ পরিণতি কী হবে কল্পনা করা যায় না।

লক্ষ-লক্ষ মহাপণ্ডিত চাই না

নতুন পদ্ধতির পাঁচটি বই পরীক্ষা করলে বোঝা যায়,

পর্ষদ চান প্রতি বছর লক্ষ-লক্ষ ছেলেমেয়ে ইংরেজিতে মহাপণ্ডিত হয়ে বেরিয়ে আসুক। কিন্তু ইংরেজিতে লক্ষ-লক্ষ মহাপণ্ডিত নিয়ে আমরা কী করব—কোন্ কাজে তাদের লাগাব? কাজেই, মাধ্যমিক স্তরে পারদর্শিতার মান অনেক নামিয়ে রাখা যায়—তাতে জাতির কোনো ক্ষতি হবে না। ভাষা-শিক্ষায় আগ্রহ আর স্বাভাবিক দক্ষতা আছে, প্রতি বছর এমন চার-পাঁচ হাজার ছেলেমেয়েকে বাছাই করে নিয়ে তাদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উন্নত সব দেশ তাই-ই করে। এর দ্বারা তারা দেশের মানবিক সম্পদের অপচয় রোধ করে।

সর্বনাশ থেকে বাঁচার পথ

ইংরেজি চর্চার ক্ষেত্রে পশ্চিম বাঙলা সমূহ সর্বনাশের সম্মুখীন। এ সর্বনাশ ঘটতে দিতে আমরা কেউই চাই না। বাঁচার পথ তিনটি, আর তার কোনোটিই দুর্গম নয়!

এক॥ সামনের শিক্ষাবর্ষ থেকে স্ট্রাকচারাল মেথডে ফিরে যাওয়া;

দুই॥ মাধ্যমিক স্তরের পাঁচ বছরে মোটামুটি-বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে কতটুকু ইংরেজি শিক্ষা নিতে পারবে, আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রয়োগ করতে পারবে, তার বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ করে পারদর্শিতার মান নির্ণয় করা (এ বিষয়ে শিক্ষকসমাজের মতকে গভীর গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা);

তিন॥ শিক্ষক-প্রশিক্ষণের বড়ো রকমের আয়োজন করা যাতে প্রতি বছর ৫০০০ শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়ে বেরিয়ে আসেন। প্রশিক্ষণের কর্মসূচি পাঁচ বছরের মধ্যে শেষ করা।

শিক্ষা নিয়ে তুঘলকি খামখেয়াল বরদাস্ত করা পাপ।

মুদ্রণপ্রমাদ

জুন সংখ্যায় প্রকাশিত "পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা" প্রবন্ধে দুটি ছাপার ভুল ঘটেছে। পৃ ১৫১, কলম ১, লাইন ৯—৫,০০০ স্থলে হবে ৫০,০০০; (২) পৃ ১৫২, কলম ২, লাইন ৯—(৬০-৭০%) স্থলে (৬০-৭৯%)। পাঠকেরা অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন।

গ্রন্থসমালোচনা

রবীন্দ্রচর্চা এবং বাংলাদেশ

রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র—ভূঁইয়া ইকবাল। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৮৫। ১৭২ পৃষ্ঠা। পঞ্চাশ টাকা।

মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ—মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৮৩। ১৫৯ পৃষ্ঠা। পঁচিশ টাকা।

রবীন্দ্র-রচনার রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা—মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৮৬। ১৮৬ পৃষ্ঠা। পঞ্চাশ টাকা।

রবীন্দ্র-প্রবন্ধে সংজ্ঞা ও পার্থক্য বিচার—মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, অগাস্ট ১৯৮৩। ২১৬ পৃষ্ঠা। পঁয়ত্রিশ টাকা।

রবীন্দ্রবাক্যে আর্ট, সঙ্গীত ও সাহিত্য—মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, অগাস্ট ১৯৮৬, ২৭৬ পৃষ্ঠা। ষাট টাকা।

রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষের সূচনায় বিচিত্র উৎসবধারা এবং বিবিধ কর্মকাণ্ডের যে বিপুল ঢক্কানিনাদ শোনা গিয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল এদেশে এবার নতুন বিক্রমে রবীন্দ্রচর্চা শুরু হবেও বা। উৎসবকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রচর্চার আয়োজন এদেশে পূর্বেও যে হয় নি তা নয়। ১৯৩১ সালে কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে শুধু যে Golden Book of Tagore এবং "জয়ন্তী উৎসর্গ"-র মতো সুপরিকল্পিত স্মারকগ্রন্থ পাওয়া গিয়েছিল তা নয়, যে-দুটি গ্রন্থকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই "গীতবিতান" এবং "সঞ্চয়িতা"র পরিকল্পনা এবং প্রকাশ সেই বছরেই। কাজ দুটিই রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বিশ্বভারতী হাতে নিয়েছিলেন। "গীতবিতান" যদিও পরবর্তী সংস্করণে কবির প্রত্যক্ষ উদ্যোগে এক নতুন রূপ পেয়েছিল। এর আগেও কবির পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবের সূত্রে অজিতকুমার চক্রবর্তী যে-গ্রন্থ রচনা করেন রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে সেইটিই আদি উদ্যোগ বলে স্বীকৃত। সেই পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবের বছরেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে "জীবনস্মৃতি" রচনা শুরু হয়। পঞ্চাশৎ বা সপ্ততিতম বর্ষে যদিও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত। তখনকার রবীন্দ্রচর্চার চেহারার সঙ্গে পরবর্তী কালের উদ্যোগ মিলবে আশা করা যায় না। পঞ্চাশৎ এবং সপ্ততিতমের পরে বড়ো মাপের উৎসব এল ১৯৬১ সালে জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে। উৎসব-অনুষ্ঠান-পুরস্কার-ভাষণ-সেমিনার (সেমিনার তখনও আজকের মতো অতি প্রচল হয়ে ওঠে নি) বাদ দিলে জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে রবীন্দ্রচর্চার দু-তিনটি বড়ো পদক্ষেপের কথা মনে পড়তে পারে। বিশ্বভারতী-কর্তৃক কয়েকটি বিশেষ ধারার রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রকাশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-কর্তৃক সুলভমূল্যে "রবীন্দ্র-রচনাবলী" প্রচার এবং বিপুলসংখ্যক স্মারকগ্রন্থের সূত্রে বিচিত্র রবীন্দ্রচর্চার প্রবর্তনা। ১৯৬১-৬২ সালে যে শ-খানেক রবীন্দ্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকখানি সুপরিকল্পিত প্রবন্ধসংকলন সংরক্ষণযোগ্য সন্দেহ নেই।

এই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষের আবির্ভাব এবং নিষ্ক্রমণ। যদিও বলে রাখা ভালো যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষ পালনের পরিকল্পনা খুবই অভিনব ভাবনা। এ-জাতীয় সমারোহের নজির বিশেষ নেই স্বদেশে বা বিদেশে। এমন-কি একশো পঁচিশতমের ইংরেজি বা সংস্কৃত প্রতীকী বা পুষ্পিত শব্দগুচ্ছ পাওয়া যাবে না অভিধানে। তা নাই পাওয়া যাক। অন্তরে ভক্তি এবং হাতে কৃত্যদায় থাকলে কি উপলক্ষের অভাব ঘটে? তাই একশো পঁচিশেই উল্লসিত হয়ে ওঠা গেল। কিন্তু সেই একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষ পার করে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে কী পাওয়া গেল। সংগীত-নাটক-নৃত্যনাট্য-সেমিনার-বিদেশভ্রমণ ইত্যাদির প্লাবনের বাইরে যা পাওয়া গেছে তাতে কি বলা যাবে যে রবীন্দ্রচর্চার এক নতুন অধ্যায় শুরু করার মতো পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে? রবীন্দ্রচর্চার নতুন উপাদানই বা পাওয়া গেল কতটুকু? উপাদানের সূত্রে বিশ্বভারতীর নাম যদি উঠে পড়ে তা হলে দোষ দেওয়া যায় না বোধ হয়। প্রায় কুড়ি বছরের চেষ্টায় তাঁরা চিঠিপত্রের একটি খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের যে উপাদান বিশ্বভারতীর অভিলেখাগারে সংরক্ষিত আছে, সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রচর্চার বিশেষ সহায়তা হবে সন্দেহ নেই। সেগুলি কবে পাঠকের হাতে পৌঁছবে তার কোনো প্রতিশ্রুতি বিশ্বভারতী দেন নি। রবীন্দ্রনাথের আঁকা চোদ্দশ'র মতো ছবি বিশ্বভারতীর আয়ত্তে সংরক্ষিত। একশো পঁচিশতম জন্মবর্ষে ছটি ছবির এক অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। এবারে বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-রচনাবলীর এক সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করছেন, যা তাঁরা করতে পারেন নি জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে। সেবারে সে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকারকে, এবারে নিয়েছেন বিশ্বভারতী। অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছে তা বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রচনাবলীর যে-বিন্যাস তা কোনো সুপরিকল্পিত সম্পাদকীয় আদর্শে স্বীকৃত নয় (১৯৩৯ সালে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে বিশ্বভারতী বাধ্য হয়েছিলেন ওই বিন্যাসে রচনাবলীর পরিকল্পনা করতে)। সেই বিন্যাসের ঐতিহ্য বিশ্বভারতীর এই সুলভ সংস্করণে অনুসৃত হল কেন—জন্মশতবর্ষপূর্তি সংস্করণের বিন্যাস হাতের সামনে থাকা সত্ত্বেও।

এইসব প্রশ্ন বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বস্তু নয়। উপাদান এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এদেশে যা করা হয় নি, তারই পরিপ্রেক্ষিতে উপাদান এবং সুযোগের অভাব সত্ত্বেও আর-এক দেশের মানুষ কী চেষ্টা করছেন সেটি বুঝতে গেলে এই পরিপ্রেক্ষা হয়তো সাহায্য করবে—এই আশাতেই বর্তমান ভূমিকা।

সৌভাগ্যের কথা যে বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার পিছনে একশো পঁচিশতম বা জন্মশতবর্ষের প্রেরণার প্রয়োজন হয় নি। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে তো আজকের বাংলাদেশ রবীন্দ্রচর্চার মানচিত্রের বাইরে এক ভূখণ্ড—পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন এক উপনিবেশপ্রায়। বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা শুরু হয়েছে এবং অব্যাহত রয়েছে এক গভীরতর কারণে। রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া বা জানার ভিতর দিয়েই এক নতুন প্রত্যয়দৃপ্ত জনসমষ্টি তার আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করছে। ফলে সেই প্রান্তে রবীন্দ্রনাথকে যতই দুর্লভ বা দুষ্প্রাপ্য করা হয়েছে, ততই তাঁরা আরও বেশি রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। উপাদানের অভাব, ঐতিহ্যের অনস্তিত্ব, অভিজ্ঞতার অপ্রতুলতা হয়তো তাঁদের রবীন্দ্রচর্চাকে আদর্শ বা অনুসরণীয় পর্যায়ে উন্নীত করে নি, তবু তাঁদের আন্তরিকতা নিষ্ঠা এবং সচেতনতা কিভাবে রবীন্দ্রচর্চার একটি ধারা সৃষ্টি করছে তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে এদেশের কাছে শিক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের প্রসঙ্গ পূর্বে উল্লিখিত। অসংখ্য ব্যক্তিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র রবীন্দ্রজীবন রবীন্দ্রকর্মকাণ্ড এবং রবীন্দ্রসাহিত্যকে যথাযথভাবে জানতে বা বুঝতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সেই চিঠিপত্র যতই বেশি সংখ্যায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়, ততই রবীন্দ্রচর্চা সহজতর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র প্রকাশের কাজ সংগত কারণে বিশ্বভারতীই শুরু করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠির পরিমাণ এখনও অনুমানসাপেক্ষ ব্যাপার। গ্রন্থাকারে আজ পর্যন্ত যত চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে, ততোধিক মুদ্রিত হয়েছে নানা সাময়িক পত্রে এবং তার চেয়েও বেশি বোধ হয় রয়ে গেছে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে। বিশ্বভারতী এ-যাবৎ চিঠিপত্রের যেসব খণ্ড প্রকাশ করেছেন তার প্রতিটি খণ্ড মূলত কোনো-এক ব্যক্তিবিশেষকে এবং সেই সঙ্গে তাঁরই স্বজন-পরিজনকে লিখিত চিঠির সংকলন। কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখেছেন সংখ্যার বিচারে বা পরিমাণে সেগুলির সংকলন একটি স্বতন্ত্র খণ্ডের মর্যাদা না পেলেও চিঠিগুলি সংকলিত হওয়া বিশেষ জরুরি, সে ব্যাপারে সকলেই একমত হবেন আশা করা যায়। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে হয়তো-বা বিষয়ানুগ চিঠিপত্রের বা কোনো বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে চিঠিপত্রের কোনো খণ্ড সংকলন করতে হতে পারে। সম্প্রতি ঢাকার বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত একটি ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ দেখে এই কথাই মনে এল। ভূঁইয়া ইকবাল আটত্রিশ জনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অর্ধশতাধিক পত্র বা পত্রাংশ সংকলন করেছেন "রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র" গ্রন্থে। এই অর্ধশতাধিক পত্রের বেশ কয়েকটি নিতান্তই পত্রপ্রাপ্তি বা প্রেরিত গ্রন্থপ্রাপ্তির স্বীকৃতি। কয়েকটি পত্রাংশ মাত্র। আবার কোথাও কবি কবিতাতেই উত্তর দিয়েছেন তাঁর অনুরাগী কোনো কোনো ব্যক্তিকে। পত্রে সমসাময়িক কোনো সমস্যার সবিস্তার আলোচনা করেছেন কবি। দুয়েকটি পত্রে সাহিত্যতর্কও আছে। এমন পরস্পর-বিসদৃশ পত্রাবলী একত্র গ্রথিত হবার কারণ—আটত্রিশজন পত্রপ্রাপক বা পত্রপ্রাপিকাই মুসলমান-ধর্মাবলম্বী। এ ধরনের বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনাসংকলন ইতিপূর্বে প্রকাশিত হবার আদৌ কোনো কারণ ঘটে নি। এই সূত্রে যদিও মনে পড়তে পারে বিশ্বভারতী একদা "পূর্ববাংলার গল্প" নামে পূর্ববাঙলায় অবস্থানকালে রচিত রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের

সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্র-রচনার পিছনে আঞ্চলিক প্রেরণা নিশ্চয়ই গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে। কিন্তু সেই ছোটোগল্প সংকলনের পিছনে যে নিতান্তই এক সাময়িক রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রেরণা সঞ্চার করেছিল, বৃহত্তর ইতিহাসের পটভূমিকায় তাকে নেহাতই অকিঞ্চিৎকর এবং পরিকল্পনাহীন বলে মনে হবে। ভূঁইয়া ইকবালের এই সংকলনও শুধু অকিঞ্চিৎকরই মনে হবে না, এর পিছনে এক সাম্প্রদায়িক মনোভাব কাজ করেছে—এমন কথাও মনে হতে পারে। কিন্তু যেখানে বসে ভূঁইয়া ইকবাল এই সংকলন করেছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথের পত্র সংগ্রহ বা সংকলনের সুযোগ এতই সীমিত যে এমন একটা অনভিপ্রেত সূত্রে পত্রগুলি সংকলিত না করলে এগুলি হারিয়ে যেত সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রচর্চার আন্তরিক আগ্রহ রয়েছে, অথচ রবীন্দ্ররচনা সংকলন যাদের আয়ত্তে নেই, তাঁদের ক্ষেত্রে এ ছাড়া উপায়ই বা কী রবীন্দ্রনাথকে আঁকড়ে থাকার। তবে সংকলক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অন্যত্র। এই অর্ধশতাধিক পত্র সংগ্রহ করতে তাঁকে পরিশ্রম তো করতেই হয়েছে, কিন্তু তিনি পত্রসংকলনেই তাঁর দায়িত্বপালন শেষ করেন নি। প্রায় প্রতিটি পত্রের সাধ্যমতো পটভূমিকা তিনি সংকলন করেছেন আর লিপিবদ্ধ করেছেন প্রতিটি পত্রপ্রাপকের জীবনতথ্য। যে-চব্বিশ জনের হীনগুণসম্পন্ন আলোকচিত্র গ্রন্থের উপসংহারে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, তাঁদের অনেকের মুখচ্ছবি আর কোথাও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। গ্রন্থের 'পূর্বলেখ'-এ সংকলক পত্রগুলির সূত্রে পত্রপ্রাপকদের পরিচয় এবং অবস্থানের এক তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। "পূর্বলেখ"-এ সংকলিত বহু তথ্যের মধ্যে জানতে পারা যায় যে আটত্রিশ জন পত্রপ্রাপকদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠের বয়স ছিল সাড়ে পাঁচ বছর, এবং পরবর্তী কালে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনায় শহীদ হয়েছিলেন, জানা যায় বন্দে আলী মিয়া কবিপ্রদত্ত কাহিনী অবলম্বনে "শেষ লগ্ন" উপন্যাস রচনা করেছিলেন, লোকমান খান শিরওয়ানী কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন, কয়েকজন রবীন্দ্রপত্রপ্রাপক পরবর্তী কালে পাকিস্তান সরকারের রবীন্দ্রসংগীত-বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করলে সেই ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন, এবং ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে কবি কখনো নিজের নামকে 'শ্রী'যুক্ত করেছেন, কখনো করেছেন 'শ্রী'হীন। এই পত্রগুচ্ছে সংকলিত রবীন্দ্রনাথের সব চিঠিই রবীন্দ্রচর্চায় অপরিহার্য বিবেচিত না হতে পারে, কিন্তু ভূঁইয়া ইকবালের সম্পাদনাপদ্ধতি রবীন্দ্র-অনুরাগীদের প্রশংসা অর্জন করবে নিঃসন্দেহে এবং সেখানেই এই ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থটির সাফল্য।

পশ্চিম বাঙলায় কিছুকাল আগে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত কিনা এবং শিক্ষায় ইংরেজির স্থান কোথায় থাকবে, তা নিয়ে বেশ বড়ো রকমের উত্তপ্ত বাদানুবাদ শোনা গিয়েছিল। স্বভাবতই উভয় পক্ষই সাক্ষী হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে যে, যে-রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৩ সাল থেকে বলে আসছেন, 'যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা অবহেলা করেন, বাঙ্গালা ভাষা জানেন না, ইংরেজি ভাষায় বাগ্মিতা প্রদর্শন করাই যাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য তাঁহারাই ইহার [ন্যাশনল ফণ্ড] প্রধান।…অথচ মুখে বলা হইতেছে people-রাই আমাদের সহায়, people দের জন্যই আমরা এতটা করিতেছি, people-দের উপরেই আমাদের ভরসা! এ সব ভাল করিবার দরকার কি? people-রা যে তোমাদের কথাই বুঝিতে পারে না। ইংরেজি ভাষায় তোমাদের তর্জন গর্জন শুনিয়া সে বেচারিরা যে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে! তোমরা যদি তাহাদের ভালোবাসিতে, তবে তাহাদের ভাষা শিখিতে।' এবং তারই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন ৫৩ বছর পরে, 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলাম, আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার মন্ত্রমুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।' তাঁকেও সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করবার সাহস পেয়েছিলেন মাতৃভাষা-বিরোধী ইংরেজি ভাষার প্রবক্তারা। তার একটা কারণ বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার সপক্ষে কখন্ কোন্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কী বলেছেন তার আনুপূর্বিক ইতিহাস আমাদের হাতের সামনে কেউ তুলে ধরেন নি। পশ্চিম বাঙলায় একেবারে কোনো চেষ্টা হয় নি, তা বলা হয়তো ঠিক হবে না। শ্রী কুমুদকুমার ভট্টাচার্যের "আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা" বেরিয়েছিল ১৯৮২ সালে। যদিও সে গ্রন্থ কিঞ্চিৎ রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রভাবে উগ্রভাবাপন্ন ছিল বলে পাঠকসমাজে অভিপ্রেত প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি মনে হয়। প্রবোধচন্দ্র সেন দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথকে ভরসা করে মাতৃভাষার সপক্ষে কলম ধরেছিলেন, কিন্তু তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে সেই তিক্ত বাদানুবাদ স্তিমিত হয়ে আসার কিঞ্চিৎ পরে। তর্কটা প্রবল হয়েছিল পশ্চিম বাঙলায়, উপলক্ষ ছিল রাজ্য সরকারের কয়েকটি প্রস্তাব এবং সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই তর্কে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছিলাম বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে। ১৯৮৩ সালে ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছিলেন মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের "মাতৃভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ"। পশ্চিম বাঙলার কথা ভেবে নিশ্চয়ই লেখেন নি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। তাঁর নিজের দেশেই অনেক বেশি জরুরি ছিল প্রসঙ্গটা। তাঁর কথায়, 'মানুষ তার মাতৃভাষাতেই নিজেকে সহজে প্রকাশ করতে পারে, তার চেয়ে বড়ো কথা, সে যদি কিছু সৃষ্টি করতে চায় তবে সেই ভাষাই তার সর্বোত্তম বাহন। তবু কথা থেকে যায়। কোথায় আমাদের মঙ্গল সে সম্পর্কে হিতার্থীদের যখন দুর্ভাবনার শেষ নেই। একটা চিন্তা মাঝে মাঝে মনে আসে, 'উর্দু ই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে' এই ফরমানের পরিবর্তে যদি এলান্ করা হত, 'ইংরেজিই রাষ্ট্রভাষা থাকবে,' তবে কি আমাদের সমাজে কোনো ব্যত্যয় দেখা দিত? অবস্থাদৃষ্টে অনুমিত হয়, মাতৃভাষার সপক্ষে পুনরাবৃত্তির আজও প্রয়োজন রয়েছে। নিজের ভাষায় সেই কাজটা সমাধা না করে ভাবলাম, রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই সেই কাজটা সম্পন্ন হোক-না।' উর্দু র বদলে ইংরেজিকে বসালে যে অবস্থা হত বলে হাবিবুর রহমান আশঙ্কা করেছেন, পশ্চিম বাংলায় সেইটাই বাস্তব সমস্যায় দাঁড়িয়েছে, এবং সেখানেই এই গ্রন্থের বক্তব্য পশ্চিম বাঙলার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক নয় কোনোক্রমেই। গ্রন্থকার তাঁর "পূর্বাভাষ"-এ একটি জরুরি কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'যারা মানুষের কাছে যেতে চায় না তারাই মানুষকে ভাষার লড়াইয়ের দিকে ঠেলে দেয়।' তিনি একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে 'মাতৃভাষার বনেদী বাংলা হচ্ছে দেশী ভাষা', যে ভাষার সপক্ষে সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল হাকিম বলেছিলেন, 'দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়। নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে ন যায়।' মাতৃভাষার লাঞ্ছনা ইতিহাসের বিচারে কী ভাবে আপন মহিমা সৃষ্টি করে তার দৃষ্টান্ত হাবিবুর রহমান দিয়েছেন মাতৃভাষায় বাইবেল তর্জমা করার অপরাধে একদা ওয়াইক্লিফকে কবর থেকে তুলে এনে পুড়িয়ে সেই দেহভস্ম নদীতে ফেলে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু আজ আমরা জানি ওয়াইক্লিফের প্রয়াসই বাইবেল প্রচারের একমাত্র অবলম্বন। মাতৃভাষায় বাইবেল অনূদিত না হলে কোথায় পৌছাত খ্রীষ্ট ধর্ম? ইসলামেও কোনো স্বর্গীয় ভাষার উল্লেখ নেই। কোরআনে বলা হয়েছে, 'মককায় ও তার আশেপাশে যারা বাস করে…তার জন্য আমি তোমার প্রতি আরবি ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি।' ইতিহাসের অনেক খবরের পরিপ্রেক্ষিতে সাতটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে গ্রন্থটিতে, যার প্রত্যেকটিরই নায়ক হলেন রবীন্দ্রনাথ। গ্রন্থটির গৌরব সবচেয়ে বেড়েছে ১৮৮৩ সালে লেখা "ন্যাশনল ফণ্ড" প্রবন্ধটি সংযোজিত করে। এ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে এখনও অন্তর্ভুক্ত হয় নি। সমসাময়িক প্রয়োজনের সঙ্গে রবীন্দ্রচর্চার সংযোগসাধনই নয়, দুষ্প্রাপ্য রবীন্দ্ররচনা উদ্ধার এ গ্রন্থকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে সন্দেহ নেই।

পুলিনবিহারী সেন পরিহাস করে বলতেন, 'রবীন্দ্রনাথকে বোঝার সহজতম উপায় হল রবীন্দ্রনাথের সাহায্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পড়া।' এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি যখন রবীন্দ্র-রচনাবলী বা রবীন্দ্রনাথের কোনো বিশেষ গ্রন্থের 'গ্রন্থপরিচয়' সংকলন করতেন, তখন রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকেই কোনো বিশেষ গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি সংকলন করতেন। তিনি জানতেন সে কাজ খুব সহজসাধ্য নয়। তাই অনেককেই অনুরোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে বা কোনো রচনায় যেখানেই রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা সম্বন্ধে কোনো উক্তি বা মন্তব্য পাওয়া যায় তা যেন সূচীবদ্ধ করে রাখা হয়। রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রাথমিক কৃত্য। কিন্তু সে কাজ যথাযোগ্য গুরুত্বসহকারে এখনও শুরু হয়েছে বলা চলে না। শুরু তো একটা কোথাও করতে হবে। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কম্প্যুটার বসিয়ে কন্‌কর্ডেন্সের কাজ শুরু হল বলে। তাহলে তো এসব কাজ সহজেই সমাধা হয়ে যাবে। যদিও সমগ্র রবীন্দ্ররচনার সংগ্রহ সম্পূর্ণ না হলে বা তাঁর রচনার বিশুদ্ধ পাঠ নিশ্চিতভাবে নির্ণীত না হলে কন্‌কর্ডেন্স হবে কার সে প্রশ্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে কোনো

অত্যুৎসাহী পাঠক যদি নিজের আনন্দে কোথায় কোথায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর "অচলায়তন" সম্বন্ধে বা "স্বদেশী সমাজ" সম্বন্ধে কী বলেছেন তা সংকলন করেন তার সাহায্য চাইবেন এমন রবীন্দ্রানুরাগীর অভাব হবে না মনে হয়। ঢাকার বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের "রবীন্দ্র-রচনার রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা" এমনই একটি বই। এ সংকলন যে 'অসম্পূর্ণ তা যে কোনো বিদগ্ধ পাঠকের কাছে সহজেই ধরা পড়বে'—সংকলকের এ স্বীকৃতি কোনো অযথা বিনয় নয়, তা যে-কোনো একটি প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-উদ্ধৃতি বিচার করলেই স্পষ্ট হবে। "অচলায়তন" সম্বন্ধে "আত্মপরিচয়" এবং ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিপত্র ভিন্ন অন্য কোথাও রবীন্দ্রনাথ কিছু বলেন নি, এটা নিশ্চয়ই সঠিক তথ্য নয়। এ তো গেল অসম্পূর্ণতার দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্র-রচনার রবীন্দ্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "অর্থোপার্জনের উপায়" একটি প্রসঙ্গ হবে কেন তা বোঝা গেল না, "কবিতার রচনার কাল" বা "নামের মোহ"ই বা কী করে প্রসঙ্গের মর্যাদা পেল!

আলোচ্য সংকলনটির দুর্বলতম অংশ রবীন্দ্রনাথ-চিহ্নিত অর্ধশতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী কয়েকটি প্রসঙ্গ, যার মধ্যে "স্বীয় কবিতার অনুবাদ", "আত্ম-বিশ্লেষণ", "আত্মসংশয়", "কবি-পরিচয়", "মৃত্যু", গল্প", "ছবির নামকরণ", "নাম", "পৃথিবী", "বাণী", "ব্যাখ্যা", "ভুল", "মতপরিবর্তন", "হস্তাক্ষর" ইত্যাদি রয়েছে, এই প্রসঙ্গগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি নিয়ে পাঠকচিত্তে অনুসন্ধিৎসা থাকতে পারে, কিন্তু এ প্রসঙ্গগুলি রবীন্দ্ররচনার রবীন্দ্রব্যাখ্যা নয় কোনোক্রমেই। গ্রন্থটির অসম্পূর্ণতা এবং পরিকল্পনাহীনতা পীড়া দেয় স্বাভাবিক কারণেই। তবু গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ করবার দায়িত্ব আজ না হোক কাল কোনো প্রতিষ্ঠানকে (নিঃসঙ্গ ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ আছে) নিতেই হবে। এই গ্রন্থের শিরোনামটি তাই একটি অবশ্য কর্তব্য রবীন্দ্রচর্চার স্মারক হয়ে থাকবে।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের একটি বিশেষ প্রবণতা দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়তে-পড়তে কোথায় কোনো একটি বিশেষ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কী বললেন বা কোনো প্রচলিত প্রসঙ্গের সংজ্ঞা নির্ণয়ে তিনি কখন কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেগুলিকে সংকলন করা। হাবিবুর রহমানের এই খেয়াল থেকে আরও দুটি গ্রন্থ প্রস্তুত হয়ে গেছে—"রবীন্দ্র প্রবন্ধে সংজ্ঞা ও পার্থক্যবিচার" (১৯৮৩) এবং "রবীন্দ্রবাক্যে আর্ট সঙ্গীত ও সাহিত্য" (১৯৮৬)। দুটিই ঢাকার বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা। গ্রন্থের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সংকলকের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে বহু পরিশ্রমও যে একটি সার্থক গ্রন্থ সৃষ্টি করতে পারে না, এ দুখানি গ্রন্থই তার প্রমাণ। মনে হয় সংকলকের সংকলিত কার্ডের উদ্ধৃতিগুলিকে তিনি নিজের পড়ার টেবিলে রেখে নিশ্চিন্ত না থাকতে পেরে যে-কোনো মোড়কে পাঠকের দরবারে হাজির করতে চেয়েছেন। তাঁর ভরসা বা সান্ত্বনা পাঠক কিছুতেই বই দুখানি ফেলে দিতে পারবেন না, কারণ উদ্ধৃতিগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে চয়িত এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি কখন্ যে কোন্ কাজে লাগে তা কি কেউ বলতে পারে!

উল্লিখিত গ্রন্থগুলির সমালোচনা বর্তমান নিবন্ধের প্রাথমিক আলোচ্য নয়। কিন্তু উপাদানের অপ্রতুলতা এবং অন্যান্য সুযোগের অভাব সত্ত্বেও রবীন্দ্রচর্চা কিভাবে অব্যাহত রাখা যায় বাংলাদেশের গবেষকবৃন্দ তার যে দৃষ্টান্ত রাখছেন, সেখান থেকে আমরা যদি কিছু দিগ্‌দর্শন পাই সেই আশাতেই কয়েকটি কথা বলার চেষ্টা।

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

অনুকরণ : নিরীক্ষা : যথাযথ জীবনচিত্রণ

জানালা—উৎপলকুমার গুপ্ত। সময় প্রকাশনী, মুর্শিদাবাদ। দশ টাকা

দ্বন্দ্ব—শঙ্কর ভট্টাচার্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বর্ধমান শাখা, বর্ধমান। দশ টাকা।

চৌরিগাছার মেয়ে—সৈয়দ আব্দুল বারি। প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সী, কলকাতা-নয়। পনের টাকা

বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, বিশুদ্ধতা এবং নির্মাণের নির্দিষ্ট রূপারোপ নিশ্চিতকরণে ছোটো প্রকাশনসংস্থা এবং লিটল ম্যাগাজিন-গুলির এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ছোটো প্রকাশনসংস্থা এবং লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকার গুরুত্ব আর একবার চিহ্নিত হল অমিয়ভূষণ মজুমদারকে কেন্দ্র করে। আলোচ্য তিনখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে

ছোটো প্রকাশনসংস্থা থেকে। "জানালা" উপন্যাসটি ১৯৮৫ সালের শারদ "সময়" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আর দুটি উপন্যাস সম্ভবত সরাসরি পুস্তকরূপেই প্রকাশিত।

উৎপলকুমার গুপ্ত, শঙ্কর ভট্টাচার্য এবং সৈয়দ আব্দুল বারি বসবাসের সূত্রে তিন অঞ্চলের। শঙ্করবাবু এবং আব্দুল বারি তাঁদের স্বক্ষেত্র থেকেই রচনার পটভূমি নির্বাচন করেছেন। উৎপলবাবু বহরমপুরের মানুষ হয়েও উপন্যাসে পটভূমি হিসাবে গ্রহণ করেন কলকাতাকে। নগরজীবনের কথকতা করার জন্য কলকাতায় লেখকের অভাব নেই; মফস্সলের একজন লেখক নানা কারণে কলকাতাকে পটভূমি হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। তবে আমাদের বলার এই, স্বক্ষেত্র নিয়ে কারবার করলে মানুষগুলির উপর, পটভূমির উপর লেখকের একটা দাপট থাকে। নিত্যদিনের প্রতিবেশী জগৎকে ব্যবহার করলে কল্পনাকে বাহন করতে হয় না, আর চেনা জগতের বাইরে গেলে সে রচনার মধ্যে অনেকটাই অস্পষ্টতা, অনুমান আর কল্পনার ঠাসাঠাসি ভিড় থেকে যায় হাজারো সতর্কতা সত্ত্বেও। শিল্পের সঙ্গে চৈতন্যের আত্মিক যোগা-যোগ, সে যোগাযোগ গড়ে তোলা এক দিনের ব্যাপার নয়, আর কল্পনার দ্বারাও সম্ভব নয়। স্বয়ং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বক্ষেত্রের বাইরে গিয়ে বদনাম কুড়িয়েছেন। আসলে চেনা জগতের বাইরে গেলে অনুকরণের যে ভয়টা জুজুর মতো চেপে থাকে, উৎপলবাবুর ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি গ্রাস হয়ে গেছে। তাঁর "জানালা" উপন্যাসের কোনখানেই মৌলিকতা নেই, আগাগোড়া অক্ষম অনুসরণ।

শারদীয় "আনন্দবাজার পত্রিকা" ১৩৯০-এ প্রকাশিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "শ্যাম সাহেব" উপন্যাসটির প্লট, চরিত্রপরিকল্পনা, এমনকি সংকটও উৎপলবাবু "জানালা" উপন্যাসটিতে গ্রহণ করেছেন হুবহু। শ্যামুয়েল অ্যারাটুন=হেমেন্দ্রপ্রসাদ, চন্দ্রা=অরুণা, সুনন্দা=অণিমা, সিরিণ=ছন্দিতা, রিকিং=মুকুল—এমনি করে ছোটোখাটো চরিত্রগুলির ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য দেখানো যায়। আর উৎপলবাবু যেটুকু অভিনবত্ব এনেছেন সেটুকু না করলে হুবহু নকলের অভিযোগ আনা যেত। একটা ঘটনার সঙ্গে আর-একটা ঘটনার মিল হতেই পারে। ঘটনা এবং চরিত্র উপন্যাসের অবলম্বন, একটি উপাদানমাত্র। উপন্যাসপাঠক অবলম্বন বা উপাদানটিকেই দেখে না, দেখতে চায় সমগ্র শিল্পটিকে। উৎপলবাবু সেখানেও আমাদের হতাশ করেন। নতুন লেখকের মধ্যে সবসময় সমকালকে উতরে যাবার চেষ্টা ছুটো-পুটি কাটে। তিনি ডিঙিয়ে না যেতে পারেন, বদলে আঘাত খেতে পারেন, কিন্তু চেষ্টাটাই তাকে মহৎ করে দেয়। তাঁর আত্মদান সাহিত্যের ইতিহাসে মহান হয়ে থাকে। ফলে পাঠক অনুকারক চায় না, চায় এক সৃষ্টিশীল লেখককে,—তাঁর সৃষ্টিপর্বে যদি বুকের রক্ত ঝরে তাও। বলা বাহুল্য, রচয়িতা আদর্শ খোঁজেন, চান আশ্রয়। আশ্রয় এবং আদর্শ নির্বাচন করতে হবে এক যুগান্তকারী, শক্তিমান লেখককে। সংবাদপত্রমুখী ফরমুলামাফিক কাহিনীকারের কাছে নয়। উৎপলবাবু তরুণ এবং সাহিত্যে সদ্য আগত বলেই এত কথা।

শঙ্কর ভট্টাচার্য বিহার-প্রবাসী লেখক। বিহার বাংলা অকাদেমীর সম্পাদক, পেশায় অধ্যাপক। বিহার আমাদের অনেক শক্তিমান লেখকের জন্ম দিয়েছে। শঙ্করবাবু প্রথম উপন্যাসেই তৎপর শিল্পের সত্য আবিষ্কারে এবং আত্ম-আবিষ্কারের শিল্পনির্মাণে। তবে তিনি যা ঠিক করে উঠতে চেয়েছেন তার জন্য যে ভাষার দক্ষতা দরকার সে দক্ষতা এখনো শঙ্কর-বাবুর আসে নি। বিষয়ের বিস্তৃতির অনুপাতে উপন্যাসটির আয়তন ভীষণ ছোটো। এতই ছোটো যে এই স্বল্প পরিসরে প্রায় কোনো চরিত্রই পূর্ণতা পায় নি। শঙ্করবাবুও যেন চরিত্রনির্মাণ অপেক্ষা ছাঁটকাটের ব্যাপারে বেশি মনোযোগী।

৬৬ পৃষ্ঠার বইটিতে তিনটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় "রেল কলোনীর দিন-গুলি", দ্বিতীয় অধ্যায় "লৌহকপাটের দিনগুলি" এবং তৃতীয় অধ্যায় "মুক্তি"। প্রথম আর তৃতীয় অধ্যায়ে নানা চরিত্রের সমাবেশে এবং টুকরো-টুকরো ঘটনার মাধ্যমে জীবনের দ্বান্দ্বিকতাকে রূপ দিয়েছেন মনস্তত্ত্বের, চরিত্রের এবং পটভূমির অন্তর্গত বাস্তবতার সাহায্যে। কাহিনীকে খুব একটা প্রাধান্য দেন নি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপন্যাসের নায়ক শঙ্খর লেখা কয়েকটি চিঠি এবং ডায়েরির সাহায্যে লেখক তার জীবনের দ্বান্দ্বিকতা এবং জেল-জীবনের বাস্তবতাকে চিত্রিত করেছেন। কয়েক-টি চিঠি এবং ডায়েরির সাহায্যে জীবনের বিস্তার এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে স্পষ্ট করা নতুন কিছু নয়। বিদেশের নজির বাদ দিই, প্রেমচন্দের "দুই সখী", অন্নদাশঙ্কর রায়ের "রত্ন ও শ্রীমতী" অন্তত সার্থক ওই রীতিতে।

কয়েকটি চিঠি আর ডায়েরির সাহায্যে জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে গেলে ওই চিঠি এবং ডায়েরির চাই ব্যাপ্তি আর প্রাসঙ্গিকতা। ঠিক এরই অভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়টি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। কেননা জেল ঠিক কোনো অর্থেই শঙ্খের জীবনে তাৎপর্য আনে না। জেলের বস্তুবাদী ভাবনা জেলের বাইরে রোমানটিকতায় (তৃতীয় অধ্যায়) ভেসে যায়। প্রথম অধ্যায়ে যে দ্বন্দ্ব নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে, ক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে তা হয়ে ওঠে অনির্দিষ্ট এবং এই অনির্দিষ্টতার সূত্রে শঙ্খ, শঙ্খের মা গার্গী, সমস্ত উপাদান সত্ত্বেও সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং নিরালম্ব চরিত্রে পরিণত হয়। তারা উপন্যাসের ক্রমমুখী বাস্তবতার সঙ্গে অন্বিত হয় না এবং তাদের কার্যপরম্পরার কোনো ভিত্তি-ভূমিও নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে না শেষ পর্যন্ত।

তবু প্রথম অধ্যায় "রেল কলোনীর দিনগুলি"র একটি স্বতন্ত্র প্রাসঙ্গিকতা আছে। বিহারের রেল কলোনির জীবনের একটি নিখুঁত ছবি উপহার দিয়েছেন লেখক। কলোনির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, নীচতা, রুচি এবং জীবন-যাত্রার বিরল পোর্ট্রেট প্রথম অধ্যায়টি। আলাদা করে এই অধ্যায়টির জন্য শঙ্করবাবুর প্রশংসা প্রাপ্য। আমরা তো প্রথম অধ্যায়টির অনুসন্ধানের সৃজনশীলতায় পেতে চেয়েছিলাম গোটা উপন্যাসটিকে। মানবজীবনের পূর্ণতার অনুষঙ্গে আমাদের অজানা জগৎটিকে জানতে চেয়েছিলাম এক শিল্পীর পরিচ্ছন্ন শিল্পকর্মের সূত্র ধরে। শঙ্কর-বাবুর সম্ভাবনা ছিল, অথচ পূর্ণতর ব্যবহার করেন নি তিনি; প্রত্যাশা ছিল বড়ো, পেয়েছি প্রায় কিছুই না।

সৈয়দ আব্দুল বারির "চৌরিগাছার মেয়ে" উপন্যাসটি টেনে রাখে কাহিনীর জোরে, সামাজিক বাস্তবতায়, যথাযথ জীবনচিত্রণে এবং চরিত্রের পূর্ণতায়। লেখক যখন স্বভূমিতে, আলো-বাতাসের স্বাভাবিকতায় তাঁর যে চার-পাশ, সেখানে দাঁড়িয়ে রচনা করেন তখন রচনায় তাঁর একটা দাপট থাকে। এই রচনায় লেখকের সেই দাপট বর্তমান কাহিনীনির্বাচনে, চরিত্রসৃজনে, বাস্তবতায়, পটভূমিতে। বরং ভাষার দিক থেকে লেখক দুর্বল। এই বইটির পূর্বে আরও ছয়খানি বইয়ের রচয়িতা হলেও আব্দুল বারির ভাষা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সৌরীন্দ্রমোহন কিংবা ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের ভাষাবৃত্তকে ডিঙিয়ে যেতে পারে নি। এই ভাষা-তেই তিনি যেন স্থিত, এমনি একটা প্রবণতা সর্বত্র, ফলে সমস্ত উপাদান প্রথম শ্রেণীর হয়েও ভাষার নাবালকত্ব সৈয়দ আব্দুল বারিকে কখনও শিল্পীর মর্যাদা এনে দেবে না।

উপন্যাসটির আলোচনার প্রাসঙ্গি-কতা এখানেই যে, লেখক অকপটভাবে শৈল্পিক নির্বাচনের দিকে না গিয়ে মুসলিম সমাজের খুঁটিনাটি বিবরণসহ এক অজানা জীবনযাত্রাকে তুলে ধরেছেন। অপূর্বভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে শ্রমজীবী রহিমা নামের এক তালাক-প্রাপ্ত মেয়ের চোখ দিয়ে তুলে ধরেছেন সমাজের সচ্ছল পরিবার গরিব পরি-বারের মানবিক পার্থক্য, ধর্মীয় কু-সংস্কার, দাদান বা ধার অশাস্ত্রীয় হওয়ায় হিন্দুদের কাছে ধার নেওয়ায় গরিব মানুষের অসুবিধা, ধর্মীয় কুসংস্কারে মানুষের প্রগাঢ় বিশ্বাস, মৌলবী সাহেবের তেলপানি পড়া, বিবাহের আদ্যন্ত নিয়মকানুন—সব মিলিয়ে অনবদ্য। লেখক এত পুঙ্খানু-পুঙ্খ বর্ণনা করেছেন যে কোনো-কোনো জায়গায় ডকুমেনটেশনের স্বভাব পেয়েছে। তবে অযথা কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নি কোনো-খানেই।

আব্দুল বারির পাঠক ঠকানোর কোনো চেষ্টা নেই। একটি সুন্দর সরল গল্প আছে উপন্যাসটিতে। সাধারণ-ভাবে বেঁচে থাকার মধ্যে যে বক্রতা জীবনকে জটিল করে সেইটুকুই এই উপন্যাসের বক্রতা। প্রাথমিকভাবে মনে হয়, তালাকপ্রথার অমানবিক দিকটিকে তুলে ধরাই লেখকের উদ্দেশ্য, তেমন এক পরিস্থিতির দিকে পাঠককে ঠেলেও দেন লেখক। কিন্তু তাঁর প্রবণতা নিছক গল্প বলা, গল্পের খাতিরে তালাকপ্রাপ্ত এক মেয়ে রহিমাকে এবং সেই জটিলতাকে ভাইঝি আরমানির উপর আরোপ করে লেখক কারুণ্য সৃষ্টি করেন। স্থূলভাবে হলেও প্রশ্নচিহ্নহীন মানসিকতায় এই উপন্যাসটি পাঠ করলে আদতে লাভই হবে।

হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

এখন কবিতা : সময়ের পাপপুণ্য ও অস্তিত্ব-রক্ষার জটিল আয়োজন

গত জন্মের ঋতু—সুব্রত সরকার। কালপ্রতিমা প্রকাশ, বি/৫ বনফুল আবাসন, কলকাতা-৪৮। সাত টাকা।

অন্য এক উপত্যকা—সৈয়দ কওসর জামাল। অর্কিড প্রকাশনী, ২৯ এইচ বি পাথওয়ে, সাহাপুর, কলকাতা-৩৮। পাচ টাকা।

সৌন্দর্যের মুখোশ ছিঁড়ে—শান্তিকুমার ঘোষ। রূপা, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। কুড়ি টাকা।

প্রতিদিন স্বর্গ ভাঙে প্রতিদিন স্বর্গ গড়ে—মতি মুখোপাধ্যায়। নবার্ক, ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা-৫৯। বারো টাকা।

চিত্রল হরিণী—কিরণশঙ্কর মৈত্র। প্রভা প্রকাশন, ৪ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯। পাচ টাকা।

মেগালোপলিসের পাখি—প্রত্যূষপ্রসূন ঘোষ। সংরাগ, ৩৯ চারুচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৩৩। দশ টাকা।

আমারই বলার কথা ছিলো—দীপেন রায়। নিউ বুক সাপ্লাই এজেন্সী, ১৮ এম টেমার লেন, কলকাতা-৯। ছয় টাকা।

এখনও সেখানে রক্ত গড়ায়—রত্নাংশু বর্গী। অবহি, সাউথ গড়িয়া, ২৪ পরগনা। ছয় টাকা।

পাথরে নদীর মুখ—কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। কোরক প্রকাশনী, ঠাকুর রামকৃষ্ণ রোড, চুঁচুড়া। ছয় টাকা।

রোদ ঝড় বৃষ্টি—অনির্বাণ দত্ত। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫/১বি বিধান সরণি, কলকাতা-৬। বারো টাকা।

মেঘের মিছিল—অরুণ ঘোষ। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, ২২ বি প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা-২৬। সাত টাকা।

'আমরা কেউ জানি না কেন? কেন যাঁর স্নায়ুযন্ত্র মস্তিষ্কের কোষে কোষে কোথাও কোনো স্পন্দন নেই, তিনি হঠাৎ বৃদ্ধ বয়সে কবিতার জ্বরে আক্রান্ত হন, আর কেনই বা সুর লাগামাত্র কোনো তরুণ হাতে তার ছিঁড়ে আর জোড়া লাগে না,…এ-সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো আমাদের অবচেতনের অন্ধ-কারে লুকিয়ে আছে অথবা হয়তো সেখানেও নেই।' বুদ্ধদেব বসুর একটি বহুখ্যাত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত এই বাক্য-গুলি 'এ-সব প্রশ্নের উত্তর' কোথায় আছে তার দিকনির্দেশ দেয় না ঠিকই, তবু কবি আর কবিতা সম্পর্কে যে-কোনো আলোচনায় আমাদের অনা-বশ্যক কৌতূহল আর সমালোচনার নিপুণ জালিকাবিন্যাসকে খানিকটা সংযত হতে সাহায্য করে, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

আলোচ্য কবিতাগ্রন্থগুলির চরিত্র এবং প্রতিচ্ছায়ায় পারস্পরিক মিল খুঁজতে যাওয়া নিশ্চয়ই অনর্থক পণ্ডশ্রম হবে। ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাস-অবিশ্বাস আর চেতনার নিজস্বতায় এঁদের প্রত্যেকের কণ্ঠস্বর ভিন্ন-ভিন্ন স্বরগ্রামের ঢেউ তুলবে আগ্রহী পাঠকের মানসিক তটভূমিতে। তবে আমাদের দিক থেকে যেটা বল-বার, সব ক-টি গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে এই দশকে অর্থাৎ আশির দশকে। এঁরা অনেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছেন গত দশক থেকে। তবু এই সময়ে লিখতে বসে এঁরা কেউ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এড়িয়ে যেতে পারেন নি এই সময়ের পাপ-পুণ্যের তাপ বা শীতলতা, অস্তিত্বরক্ষার জটিলতম যুদ্ধ-কালীন আয়োজন। এবং এটাই আমরা অনুভব করতে চেয়েছি খুব সচেতনভাবে এইসব কবির সাম্প্রতিক কবিতার গ্রন্থের পাতায়-পাতায়।

সত্তর দশকের কবি সুব্রত সরকারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "দেবদারু কলোনী"র পর আট বছর কেটে গেল দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "গত জন্মের ঋতু" প্রকাশের জন্য। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত লেখা কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

সুব্রতর সবথেকে বড়ো কৃতিত্ব বোধ হয় আটপৌরে সাদামাটা সব রকম শব্দকে তিনি অলিগলি থেকে ধরে এনে পৌঁছে দেন কবিতার লাইনে। অদ্ভুত তীক্ষ্ণ চোখের অধি-কারী এই কবি কী নিপুণ বলিষ্ঠতায় রচনা করেন চিত্রকল্পের রহস্যময় মায়া-জাল, চেতনা আর বোধের এক আশ্চর্য জগৎ। এই সময়ের পাপ এবং মিথ্যা-চারের অ্যাসিড-বৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে দারুণ প্রেমিকের গলায় তিনি বলে ওঠেন: 'কে আমার আঙুল ধরে টানছো, খুকু তুই, দেবাদূতা? / কখন অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছিস, আলো ও অন্ধকারের চেয়ে / এত রহস্য কোথা থেকে খুঁজে পেলি, আর মনে মনে এত শ্রাবণের / বৃষ্টির জোর, কোথায়, কখন,

করে, এইটুকু ছিলি, টের পাই নি তো।' (দেবাদৃতার জন্ম)।

"জমিল সৈয়দ-কে লেখা চিঠির অংশবিশেষ" শীর্ষক কবিতায় নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সূত্রত লেখেন : 'হাত-রিক-শায় চেপে কাকিমার কাছে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ / মনে পড়লো শুক্রবারে বোনের সস্তোষী-মা / অতএব ভাজা বা টক থাওয়া চলবে না।' "সোনার ঘণ্টা ও সূর্যাস্তের ময়ূর" এবং "বিষণ্ণ তলোয়ার হে" দীর্ঘ কবিতাদুটি পাঠ করা নিঃসন্দেহে একটি অভিজ্ঞতা। সূত্রত শক্তিমান কবি। তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা দিন-দিন বৃদ্ধি পাবে। মলাটে দাজিলিঙের প্রখ্যাত এমব্রয়ডারি-শিল্পী এবং চিত্রকর আভা দেবীর আঁকা "বিস্তি"-নামক ছবিটি বইয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

খুব নম্র গলায় নিজস্ব স্বকীয়তায় এই নষ্ট সময়ের পরাজয় ও প্রতিরোধের গল্প শুনিয়েছেন সৈয়দ কওসর জামাল তাঁর "অন্ত এক উপত্যকা" কাব্যগ্রন্থে। বিপর্যয়কর তীক্ষ্ণতায় ধানখান করে ভেঙে পড়ে আমাদের রোজকার সকালে দেখা আরশিখানা। অনেক পাহাড়ের পথ আর রোমানটিক পাথরের টিলা অতিক্রম করে জামাল আমাদের পৌঁছে দেন অবচেতনের সেই ভয়ংকর প্রান্তরে, যেখানে 'পাথরের গায়ে শেওলার শান্ত কঠিন চোখ / স্বপ্ন স্নাথে নৈরাজ্যের যেন স্থির জীবনের ছবি / যেখানে বসেছে বক, মাস্তুলের গায়ে রক্তচক্ষু স্মৃতি / ওদিকে বাতাসে ওড়ে ছেঁড়া জাল, মাছের আঁশটে গন্ধ, কাঠ···' (পাথরের দিন ২)। চূড়ান্ত অ্যালিয়েনেটেড অবস্থায় ঘুম থেকে উঠে জামাল আবিষ্কার করেন ঘুমোবার আগে পাশে শুয়ে থাকা প্রিয় নারীটি কখন যেন উঠে চলে গেছে। ক্রমাগত অসহায়তার মধ্যে দিয়ে আধুনিক মানুষের সত্তা যখন খণ্ড-বিখণ্ড হতে থাকে জামালের কবিতায়, হয়তো অনিবার্যভাবে তখন আমাদের মনে পড়ে যায় কাফকার কথা। পরাবাস্তবতার তির্যক আলো-আঁধারিতে আমাদের সত্যি-সত্যি অন্য এক উপত্যকায় পৌঁছে দেন তিনি। এবং সেখানেই তাঁর সার্থকতা।

'থামো সুন্দর মুহূর্ত' এবং "পদ্মের ভিতর আলো"র পর শান্তিকুমার ঘোষের নতুন কাব্যগ্রন্থ "সৌন্দর্যের মুখোশ ছিঁড়ে" আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় এই নির্বিকার, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর সময়ের লাশকাটা টেবিলের পাশে। নিরুত্তাপ গলায় তিনি ঠিক যেন আমাদের কানের পাশে ফিশফিশ করে শোনান : 'আমরা দুর্বল যুব, ভার-সাম্য-হারা সব : / ভীষণের মধ্যে খুঁজি সম্পূর্ণ সুন্দর / যাত্রা, কেবল শিখরের দিকে অভিযাত্রা / মৃত্তিকা-আঘাত ছাড়িয়ে এক আগ্নেয় উত্থান।' (সম্পূর্ণ সুন্দর)।

প্রেমের গ্রন্থি বড় শিথিল, সৌন্দর্যের চিরাচরিত ইমারতের কারনিশে বাসা বেঁধেছে গর্ভিনী শকুনি, চারিদিকে শুধু ভেঙে যাচ্ছে আর ভেঙে যাচ্ছে, বাতাসে ভেসে আসে কোনো আদিম পৃথিবীর ঘ্রাণ, শান্তিকুমার ঘোষ হয়তো ভরসা হারান না, তবু নিশ্চিতভাবেই এই নিলিপ্ত সময়ের ধ্বংসের স্তূপের চোরাবালিতে তাঁর পা ঢুকে যায়, চোখের সামনে ধর্ষনায়কের হৃৎপিণ্ডে ঢুকে পড়ে অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ফলা।

দামি কাগজ, চমৎকার মুদ্রণ এবং 'রূপা'র ঐতিহ্যময় প্রকাশন-সৌন্দর্য এ বইয়ের মর্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি করেছে। অরূপ গুপ্তর মলাট এবং মিলি দাসের সুন্দর অলংকরণ বইটিকে রীতিমতো আকর্ষণীয় করেছে।

ষাট দশকের কবি মতি মুখোপাধ্যায়ের বোধ আর অনুভবের একটি নিজস্ব জগৎ রয়েছে। "সন্ধ্যার জানালা" থেকে "স্থিতাবস্থা ভাঙো" যদি হয় একটি নির্দিষ্ট যাত্রাপথের মাইলফলক, মতির আশির দশকে লেখা কবিতাগুলির সাম্প্রতিক সংকলন "প্রতিদিন স্বর্গ ভাঙে প্রতিদিন স্বর্গ গড়ে" নিঃসন্দেহে কোনো অচেনা দেশের অপরিচিত সরাইখানায় আশ্রয়লাভ। বস্তুত মতি জানেন কিভাবে নিজেকে ভাঙতে হয়, নিজেকে গড়তে হয়। এ কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ ফসল দীর্ঘ কবিতা "এই বাঁচা : ক্লান্ত পরবাস"। আত্ম-আবিষ্কারের আত্ম-ধ্বংসের আত্ম-নির্মাণের ফোঁটা-ফোঁটা যন্ত্রণার স্বেদবিন্দু চিত্রিত করেছে এ কবিতার প্রতিটি শব্দ। এই ভঙ্গুর বিধ্বস্ত সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা সকলেই বুঝি মনে-মনে আত্মগতভাবে বলি : 'মঙ্গলে, অমঙ্গলে, যুগপৎ কুসুমে আগুনে কি ধ্বংসে-নির্মাণে / সুদূর উৎসের দিকে ভগ্ন আশা ঢেউ ভেঙে নাবিকের মতো / সুনিশ্চিত এই যাত্রা।'

বাসভরতি চলমান সংখ্যাহীন শব্দের মিছিলে চর্যাপদের হরিণীকে বোধহয় আবিষ্কার করতে চান কিরণশঙ্কর মৈত্র। মৃদুভাষী কিরণশঙ্কর কবিতার চালচিত্র নির্মাণে খুব নির্ভার চিত্রকল্প ব্যবহারে অভ্যস্ত। দেশজ শব্দের একেবারে আটপৌরে প্রক্ষেপণের বলিষ্ঠতায় মাঝে-মাঝে চমকে যেতে হয়। এবং সেখানেই তিনি ঋদ্ধিমান। বেশির-ভাগ কবিতা আয়তনে খুব বড়ো না হলেও গভীরতায় হৃদয়কে ঠিকই স্পর্শ করে যায়। আধুনিক জীবনের অস্তিত্ব-নির্ভর প্রতিরোধ আর সংগ্রাম কত নিলিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে "ছায়া" কবিতার এই কটি লাইনে : 'মানুষের ছায়া অথবা পশুর / ছায়া, ছায়াময়—/ মানুষটা পশু নাকি পশুটা মানুষ···/ ছায়ার ভিতরে ছায়া / ছায়াকে ধরতে গিয়ে / ছায়া হয়ে যাই—/ ছায়া আর ছায়াই থাকে না।'

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষের নতুন কবিতার বই "মেগালোপলিসের পাখি", ষাট দশক থেকে কবিতা লিখতে শুরু করলেও সত্তর দশকের প্রধান কবিদের মধ্যে নিজের আসনটি স্থায়ী করে ফেলেছেন প্রত্যুষপ্রসূন। আশির এই শেষ পর্বে তাই তাঁর কবিতায় শব্দের নতুন দেহবিভঙ্গ, ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুভবের নতুন দিগন্ত আমাদের সব সময় কৌতূহল জাগায়। সাম্প্রতিক কালে লেখা এই কবিতা-গুলির অনুষঙ্গে মিশ্রিত রয়েছে এক অবিচ্ছিন্ন বিষণ্ণতা ; আসন্ন আণবিক যুদ্ধের অনিবার্য পরিণতির অপেক্ষায় কিংবা প্রেম-নামক মানবিক অনুভূতির নিস্ব রিক্ততায়। খুব ধীরে-ধীরে তিনি বলেন : "আমাকে নিওনা টেনে এতো নীল অভ্যন্তরে আচ্ছন্ন চেতনায় / এ কোন্ বেহালা ছড়ায় অথর্ব কান্না, রোজ রাতে কেন স্বপ্নে দেখি / ময়ূরের ডানায় অপ্রেমের মৃত্যুচিহ্ন, হীরের ঝলকে জলে নাকছাবি!' (কমলা-রঙের আগুন)।

দীপেন রায়ের গ্রন্থ 'আমারই বলার কথা ছিল' আশির দশকে প্রকাশিত হলেও সত্তর আর আশি দুই দশকের কবিতা মিলেমিশে এখানে ঠাঁই করে নিয়েছে। তিনটি অংশে বিভক্ত এ বইয়ের প্রথম গুচ্ছ কবিতার শিরোনাম : "রাখাল বালকের সাথে"। প্রধানত প্রতিবাদী কবিতার সুর ধ্বনিত হয় দীপেনের এইসব কবিতায়। ইতিহাসের বিশাল প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য-ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানবসমাজের অসম্মান আর পরাজয়ে ক্রুদ্ধ দীপেন রাগী-রাগী শব্দে কবিতা লেখেন। দ্বিতীয় পর্ব "ঘরে বড়ো বিষ"কে একটি দীর্ঘ কবিতা বলে বোধহয় ভুল হয় না। একটি দরদি, বিষাদগ্রস্ত মানুষের চাপা কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় এ কবিতায় : "এই রইলো আমার ভালোবাসার চোখ জোড়া, / তেতরের আবেগে কাঁপতে কাঁপতে / বুকের কাছে তোমাকে জড়িয়ে / এই রইলো আমার জীবন।' তৃতীয় পর্ব "শিউলি ও ভারতবর্ষ"-এ ক্রোধ আর যন্ত্রণায় দীপেনকে ফেটে পড়তে দেখি।

রত্নাংশু বর্গীর "এখনও সেখানে রক্ত গড়ায়" কাব্যগ্রন্থে একগুচ্ছ কবিতা ছাড়াও রয়েছে একটি সম্পূর্ণ কাব্য-নাটিকা — 'সুমন্ত'। কবিতাগুলির আলাদা কোনো সূচীপত্র নেই। বোধকরি তাঁর সব কবিতা একটি নির্দিষ্ট বোধ আর অনুভূতিকে চিত্রায়িত করছে, তাই আলাদাভাবে সূচীপত্রের মাধ্যমে কবিতাগুলির পৃথক অস্তিত্ব প্রকাশে ব্যগ্রতা দেখান নি রত্নেশ্বর। বস্তুত তাঁর কবিতায় ছোটো-ছোটো বাক্যবন্ধ এবং সহজ, পরিচিত চিত্রকল্পের আঁচড়ে সমগ্রতার ব্যঞ্জনা খুব সহজেই স্থাপিত হয়।

"সুমন্ত" কাব্যনাটকে শকুন্তলা আর দুষ্মন্ত চরিত্র দুটিকে আরকিটাইপ হিসেবে ব্যবহার করে আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের স্বাধীনতার অধিকার এবং সাম্রাজ্যবাদের সীমাহীন লোভ আর অত্যাচারের ইতিহাসের ধারাকে গ্রন্থনী আঙ্গিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য সুমন্তর পলায়নী মনোবৃত্তি থেকে তার হঠাৎ মানসিকতার পটপরিবর্তন একটু যেন হঠাৎ এসে যায়। আত্ম-আবিষ্কারের পথে দ্বিধাদ্বন্দ্ব অতিক্রম করার পথে চরিত্রগুলির মধ্যে আর-একটু টানাপোড়েন স্থাপনের প্রয়োজন ছিল।

শব্দের প্রতিমায় খুব সুন্দর প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছেন কার্তিক চট্টোপাধ্যায় তাঁর "পাথরে নদীর মুখ" কাব্যগ্রন্থে। রঙিন কাচের পাত্র ভেঙে দুঃখগুলো মেঘের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়ে খুব নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারেন না কার্তিক। তিনি ভালোভাবে জানেন : 'সুখগুলো আজ শুকিয়ে গেছে ফুল বাগানে তীব্র দাহ/খড়কুটো আর আবর্জনায় পুড়ছে কেবল সবুজ মোহ/ পাথর সে কী বরফ হয়ে/ঝরিয়ে দেবে অগ্নিকণা ?' (মেঘ জমেছে)।

মাঝে-মাঝে মনে হয় মধ্যযুগের ইউরোপীয় রোমানটিক কবিতার প্রতিধ্বনি অনুরণিত হয় কার্তিকের কবিতায়। বিশেষ করে ভাবিয়ে তোলে "দুঃখবোধ", "আজ সারাদিন", "পরিব্রাজক" প্রভৃতি কবিতা। "অনেকেই জানতো না" কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি : 'অনেকেই জানতো না কখন পাহাড় / নদীর

নিকটে গিয়ে / রাত কাটিয়েছে ভালবেসে / আর সেই প্রেম নির্মাণ করেছে এই দ্বীপ।'

অনির্বাণ দত্তের শেষ কাব্যগ্রন্থ "সত্তর দশক" বেরিয়েছিল একাশিতে। তারপর দীর্ঘ ব্যবধানে "রোদ ঝড় বৃষ্টি"। তিনটি অংশে বিভক্ত এই নতুন কাব্যগ্রন্থ। "রোদ"-পর্বে কিছু লিরিক। "ঝড়"-পর্বে অনুবাদ। এবং "বৃষ্টি"-পর্বে কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা। একটি বিশেষ রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতি সজাগ এবং বিশ্বস্ত থেকেও অনির্বাণের প্রধান কৃতিত্ব নিছক শ্লোগানধর্মী কবিতা লেখায় তিনি আস্থা রাখেন নি। কবিতা কবিতার মতো ছলছল করে বয়ে চলে অনুভূতির তীব্রতা নিয়ে, সোঁদা মাটির গন্ধ মেখে, সংখ্যাহীন শ্রমজীবী মানুষের ক্ষুধা আর অস্তিত্ব-রক্ষায় যুদ্ধযাত্রার পদধ্বনি শুনিয়ে। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত কবিতা "তিনিই এই" পড়তে-পড়তে গোপনে কোথাও বুঝি ক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। "খেলা", "অজ্ঞাত এক যুদ্ধের গান", "প্রাণ" প্রভৃতি কবিতা আশির দশকের পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেয় এক ভয়ংকর বাস্তবতার মুখোমুখি। বেনজামিন মেলিয়েজ, পাবলো নেরুদা, মুশা জলিল, ইলিয়া এরেনবুর্গ, বেরটোল্ট ব্রেশট প্রভৃতির কবিতার অনুবাদ সাবলীল, স্বচ্ছন্দ এবং মূলের যথাযথ স্বাদবহ।

পাঁচ বছর পদ্য-টদ্য চর্চা করার পর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সময় কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর-একটু সংযত আর নিষ্ঠুর হতে পারতেন অরুণ ঘোষ। তাঁর "মেঘের মিছিল" কাব্যগ্রন্থের মূল সুর একজন বিবেকবান, জীবনদরদি কবির কণ্ঠস্বর। মাঝে-মাঝেই উচ্চগ্রামে কথাবলার ঝোঁক বেশ লক্ষ করা যায়। কিছু-কিছু কবিতায় পূর্বসূরী কবিদের প্রভাব এখনো এড়িয়ে যেতে পারেন নি। একজন নবীন কবির পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। আমরা কিন্তু ভরসা রাখতে পারি সেই কবির ওপর, যিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন : 'কে জুড়েছে মেঘে মেঘে অসম্ভব গতিময় ডানা / উর্দ্ধশ্বাসে তারা ছুটোছুটি ক'রে চারিদিকে / অট্টহেসে ফেটে পড়ে সীমাহীন আকাশের মাঠে / আদিগন্ত উৎসাহে অস্থির সমুদ্রের মত, / শোনে অবিরাম / কে ডাক পাঠায় এক অনিবার্য আন্তরিক স্বরে—'

কামাল হোসেন

কাব্যে ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন যুগ

অমরভারতী—রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। মডার্ণ কলাম, কলকাতা-৯।১৯।৮৪। ত্রিশ টাকা।

বিস্ময়কর যত্ন, শ্রম, নিষ্ঠা আর অধ্যবসায়ের স্বাক্ষর "অমরভারতী" কাব্যগ্রন্থটি। মহাকাব্যবিমুখ সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসের কাব্যরূপ অসম্ভব না হলেও অবিশ্বাস্য। আণবিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানী রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই বিরল কর্মে ব্রতী দেখে যে-কোনো পাঠক স্তম্ভিত হবেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের The History and Culture of the Indian People গ্রন্থটিকে অনুসরণ করে ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন যুগের অনুপুঙ্খ বিবরণ লিখেছেন কাব্যে। কাশীরাম দাসের ছন্দে অর্থাৎ পয়ারে "ভূগোলবৃত্তান্ত" দিয়ে কাব্যটির সূত্রপাত এবং এটিই প্রথম পর্ব। পরে আরো ছটি পর্বে কাব্যটি বিন্যস্ত—সেগুলি যথাক্রমে হল প্রাক্-আর্যযুগ, সিন্ধু-সভ্যতার যুগ, আর্যের আদিযুগ, মধ্য আর্যযুগ, ভারতে রাজন্যের ইতিহাস এবং আর্যের শেষ যুগ। এই পর্বগুলিকে আবার সর্গে বিভক্ত করা হয়েছে মহাকাব্যের প্রথাগত ধারাটির দিকে লক্ষ্য রেখেই। স্বাভাবিকভাবে, অষ্টাদশপর্ব মহাভারত বা সপ্তকাণ্ড রামায়ণ আমাদের স্মরণে এসে যায়। ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত কয়েকটি চমৎকার ছবিও বইটির মূল্যবৃদ্ধি করেছে।

এত আয়োজন ও প্রশংসনীয় পরিশ্রম সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠতে পারে—এই রচনাটির তাৎপর্য কী, এবং কারা এই গ্রন্থটি পাঠ করে আনন্দ আহরণ করবেন! সত্যিকারের একালীন কবিতা-পড়ুয়ারা এই দীর্ঘ কাব্য থেকে কী রস পাবেন! ইতিহাসপাঠের মগ্ন আনন্দের জন্যে স্বয়ং রমেশচন্দ্র মজুমদারই তো সঙ্গী হতে পারেন। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং কবি প্রসঙ্গত লিখেছেন—'আমার শ্রোতা, আমার পাঠক, তাঁরা গ্রামে, চণ্ডীতলায়, ঘরের কোণে ঘোমটাটানা লাজুক বধূ—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অথবা ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক নন।' কিন্তু সত্যতর অর্থে গ্রামীণ জীবন এখন বিপুলভাবে পালটে গেছে, সেখানে রেডিও / টিভি / সিনেমা / যাত্রা পৌঁছে গেছে, সেখানে দাওয়ায় হিন্দিগান, লাইব্রেরিতে লঘু উপন্যাসের ছড়াছড়ি, সেখানকার মানুষ-মানুষীরা সুর করে এখন আর রামায়ণ বা মহাভারতই পাঠ করেন না ; তো, রমেনবাবুর কাব্যে ভারত-ইতিহাস পাঠ করবেন এমন প্রত্যাশা প্রায় মরীচিকা-দুরাশামাত্র।

সমগ্র কাব্যটিতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছন্দযতি-মিলের যথাযথ রূপারোপ কবির যত্ন এবং নিষ্ঠার পরিচয় বহন করছে, কিন্তু কিছু-কিছু ক্ষেত্রে তিনি অক্ষরবৃত্তের মাত্রাশোষণক্ষমতা সম্পর্কে অনবহিত বলে মনে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'লক্ষ লক্ষ দীপ জালি নৈশপ্রহরী / কি রহস্য প্রহরীছে ব্রহ্মাণ্ডেরে ঘেরি।' এখানে কবি 'নৈশ'কে তিনমাত্রার গৌরব দিতে চেয়েছেন কিন্তু এটি দুমাত্রাই। অর্থাৎ কবি 'নৈশ' শব্দটি একটু টেনে পড়ে নিতে বলছেন। আবার কোথাও-কোথাও অসুস্থ অন্ত্যমিল দেখতে পেয়ে হোঁচট খেতে হয়, যেমন, 'যজ্ঞ-বিধি বিভাজিয়া শ্রুতিস্মৃতি প্রথে / মহাযজ্ঞ, গৃহযজ্ঞ সমাজেতে বিধে।' 'প্রথে'র সঙ্গে 'বিধে' কিছুতেই সুস্থ মিল নয়। এমন আরো অনেক উদাহরণ উদ্ধার করা যায়। অবশ্য এ-জাতীয় ভুল কাশীদাসী মহাভারতেও বিরল নয়। সম্ভবত বিরাট রচনাতে এরকম ত্রুটি থেকে যেতে বাধ্য।

কোথাও-কোথাও কবিত্বের ছোঁয়ায় রমেন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের স্নিগ্ধ করে তুলেছেন, আবার কোথাও-কোথাও কবিত্বরিক্ত নীরক্ত উচ্চারণে বিরক্তিও যে আসে নি, এমন নয়। শেষ পর্বে চতুর্থ সর্গে কাশীরাম দাস থেকে অজস্র পঙ্ক্তি উদ্ধার করেছেন, অথচ সেইসব অংশেই নিজের কবিত্ব-শক্তি প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল।

তবু তিনিই প্রথম যিনি কাব্যে ভারত-ইতিহাস লেখার দুঃসাহসিক চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সামাজিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন এই ২২৭ পৃষ্ঠার দীর্ঘ কাব্যখণ্ডে। এজন্যে তাঁকে অভিনন্দন।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

ননসেন্‌সের আধার সু-কু-মা-র

The Select Nonsense of Sukumar Roy by Sukanta Chaudhuri. Oxford University Press. Rs 45.00

সুকুমার রায় যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে আমাদের আজকের বাঙলা সাহিত্যের দিকনির্ধারণকারীরা (অর্থাৎ যেসব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি আকাদেমী, জ্ঞানপীঠ, আনন্দ পুরস্কার ইত্যাদি দিয়ে থাকেন) নিশ্চয়ই খুব ফ্যাসাদে পড়তেন। সুকুমার রায়কে কী প্রাইজ দেওয়া হত তাহলে? শিশুসাহিত্য তো "প্রাপ্তবয়স্ক" সাহিত্য, অর্থাৎ প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য সাহিত্য নয়। তাঁদের এই সংকটের কথা মনে করেই বোধ হয় সুকুমার নিজেই লিখেছেন 'হ-য-ব-র-ল'র শেষে—

'মানুষের বয়স হলে এমন হোঁৎকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তোমাদের কি-না এখনও বয়স হয় নি, তাই তোমাদের কাছে ভরসা করে এসব কথা বললাম।'

আত্মসচেতন শিশুসাহিত্যস্রষ্টার এই উক্তি কিন্তু আমরা সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারি না। কারণ বর্তমান মূল্যায়নে সুকুমার শুধুমাত্র শিশু-সাহিত্যরচয়িতা নন। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি সর্বকালের, সর্বজনের, আর সেই-জন্যই সুকান্ত চৌধুরীর এই অনুবাদ আজকে, কবির জন্মশতবার্ষিকীতে, নতুন করে পৌঁছে দেয় বাঙলা সাহিত্যের এই একচ্ছত্র ননসেন্‌সের রাজাকে, সেই সকল পাঠকের কাজে যাঁরা বাঙলা ভাষা না জানার জন্য সুকুমার রায়কে পড়তে পারেন নি।

এই ধরনের ননসেন্‌স্ রাইমের প্রচলন ভারতবর্ষে শুধুমাত্র লোককথা আর উপকথায় আছে, বিশ্বসাহিত্যেও বিরল। কেবল এডওয়ার্ড লিয়ার, লিউইস ক্যারল ছাড়া এই ধারা কেউ বহন করেন না। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের এক বিশালসংখ্যক অবাঙালি পাঠক হাস্যরসের এই বিচিত্র রস থেকে বঞ্চিত রয়েছেন অনেক দিন। সুকান্ত চৌধুরী এই শূন্যস্থান পূরণ করেছেন খুবই মনোজ্ঞভাবে ; সত্যজিৎ রায় এই অনুবাদকে 'admirable translation' আখ্যা দিয়েছেন। আমরাও দেখি, যেমন—

The Old Man of the Woods—
"কাঠবুড়ো" ছড়ায় :

হাঁড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে যেন কে বৃদ্ধ / রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ। অনুবাদে হয়ে যায়—

A grumpy old man sat and humpily chewed / A stump of old timber, well shredded and

stewed. ধ্বনিসাদৃশ্য (assonance) এবং অনুপ্রাসের (alliteration) (যা মূল ছড়ায় ছিল না) ব্যবহারে অনুবাদ আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

যেমন, Pumpking-Puff-এ ("কুমড়ো পটাশ"):

যদি কুমড়োপটাশ ডাকে—/ সবাই যেন শামলা এঁটে গামলা চ'ড়ে থাকে ; / ছেঁচকি শাকের ঘণ্ট বেটে মাথায় মলম মাখে ; / শক্ত ইটের তপ্ত ঝামা ঘষতে থাকে নাকে। হয়ে যায় If Pumpkin-Puff should wail / You're meant to don your legal hats and climb into a pail. / You make a paste of spinach-pulp to plaster round the nape, / And heat a piece of pumice-stone to give your nose a scrape.

এখানে হয় এক নতুন ছন্দের সৃষ্টি যা সুকুমারের মূল ছন্দ হতে ভিন্ন অথচ সমান সরেস—বলাই বাহুল্য, এই নতুন ছন্দের দ্বারা অনুবাদ আরও মূর্ত হয়ে উঠেছে। অথচ এই ছড়াতেই, এই নতুন ছন্দকে আঁকড়ে রাখার চেষ্টায় দেখি এক জায়গায় ছড়ার ভাবার্থকে বলি দিচ্ছেন অনুবাদক :

"হুঁকোর জলে আলতা গুলে লাগায় গালে ঠোঁটে' সে কী করে Your cheeks and chin anoint with care in talcum blent with tar হয়, তা বোঝা দুষ্কর।

প্রসঙ্গত বলা যায়, সুকান্ত চৌধুরী ইংরাজি ভাষায় একটা চলতি ইডিয়ম খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন এবং আমরা তা পাই The Purloined Moustache ("গোঁফচুরি") ছড়ায় 'lying blighters,' 'The office staff are thick as planks, I simply cannot stand 'em. You mustn't ever give 'em rope-এর ব্যবহারে। ছড়ার মূল অর্থ বজায় রেখে, নতুন সৃষ্ট ছন্দের আর চলতি ভাষার ইডিয়মের মিশ্রণে অনুবাদটি হয়ে উঠেছে অনবদ্য।

Spook Sports ("ভূতুড়ে খেলা") এর অনুবাদও স্বচ্ছ, ঝরঝরে এবং আনন্দদায়ক। এখানে আয়রে আমার নোংরামুখো সুঁটকো রে, / দেখনা ফিরে প্যাখনা ধরে হুতোম-হাসি-মুখ ক'রে! / ওরে আমার বাঁদর-নাচন আদর-গেলা কোঁতকা রে, / অন্ধবনের গন্ধ-গোকুল, ওরে আমার হোঁতকা রে! / ওরে আমার বাদলা রোদে জষ্ঠি মাসের বিষ্টি রে, / ওরে আমার হামান-ছেঁচা যষ্টিমধুর মিষ্টি রে। / ওরে আমার রান্না হাঁড়ির কান্না হাসির ফোড়নদার, / ওরে আমার জোছনা হাওয়ার স্বপ্ন-ঘোড়ার চড়নদার। / ওরে আমার গোবরাগণেশ ময়দাঠাসা নাদুস্ রে, / ছিঁচকাঁদুনে ফোক্‌লা মাণিক, ফের যদি তুই কাঁদিস রে অনুবাদে নতুন রূপ ধারণ করে : ...'My Tiny Tim, my tatty tousled treasure, / Let's see you scowl, my pretty owl, and pout your peaky pleasure. / My podgy imp, my dancing chimp, my laughter-lapping fright, / My charming hunk, my rootling skunk in moonless woods at night. / My sunshine-thief, my summer's grief, my April shower of rain, / My sugar-pest, my syrup pressed from crunchy candy-cane, / My precious spice, my pot of rice beneath the kitchen beams, / My rider fair upon the mare of all my moonlit dreams. / My pudding-Joe, my ball of dough, my flopsy floury freak, / My crying love, my toothless dove, just let me hear one squeak। এখানে অনুবাদ শুধুমাত্র ভাষার অনুবাদ নয়—ভাবের অনুবাদ, ইডিয়মের অনুবাদ। বাঙলার ইডিয়মকে সরিয়ে রেখে ইংরাজি ভাষার এক নতুন ননসেন্স্ ইডিয়ম সুকান্ত চৌধুরী-সৃষ্টি করেছেন। যেমন "নোংরা মুখো সুঁটকো" হয়ে ওঠে My Tiny Tim, my tatly tousled treasure। অনুবাদ আজ সাহিত্যের স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তবুও এই অনুবাদ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। গুরুগম্ভীর সুরের গদ্য অথবা পদ্য অনুবাদ করা আপেক্ষিক-ভাবে সহজ।

সুকুমার লিখেছেন চলিত ভাষায়, লঘু পরদায়। তাঁর ভাষা বাঙলা ভাষার নিজস্ব ইডিয়মকে ছোঁয়। চলতি বাঙলার সেই মুখের ভাষার ইডিয়ম কি ইংরাজি ভাষায় পাওয়া সম্ভব? "ভাল রে ভাল"—All's Well ছড়ায় সুকুমার লিখেছেন : কিন্তু সবার চাইতে ভাল /—পাউরুটি আর ঝোলাগুড়। অথচ সুকান্তবাবু লিখে-ছেন : The thing I really most regard / Is eating bread and honey. পাড়ার ভজার দোকানের বাসি পাউরুটি আর পুরনো টিনের গন্ধ মাখা ঝোলা গুড়ে যে তৃপ্তি পাই, bread and honey-তে কি সেই তৃপ্তি পাওয়া যায়? অথচ এখানে molasses ব্যবহার করলেও বোধহয়

অর্থ সম্পূর্ণ হয় না।

অথবা "হুঁকোমুখো হ্যাংলা"তে যেখানে সুকুমার লিখেছেন : তাই বুঝি একা সে / মুখখানা ফ্যাকাশে / বসে আছে কাঁদ' কাঁদ' বেচারা? সুকান্ত The Lug-Headed Loon এ লিখছেন : Can that be clue / To his pallor of hue / As he sits there in dumb desolation? হুঁকোর যদি সত্যিই dumb deso-lation হত তাহলে দুঃখটা আরো প্রবল হত। কাঁদ' কাঁদ' ফ্রেজ-এর মধ্যে লুকিয়ে নেই একাকিত্বের মূক যন্ত্রণা, বরঞ্চ একটা সূক্ষ্ম মজা যা dumb desolation-এ পাই না।

A Marriage is Announced ("সৎপাত্র") ছড়ায় সুকান্ত Posta, Lahiri of Banagram ব্যবহার করে-ছেন, অথচ Burglar Alarm ছড়াটিতে রামু ও দামু, ঘোষ ও বোসকে Tom, Dick and Harry-তে পরিণত করার বোধহয় কোনো দরকার ছিল না।

The Music Makers ("দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম") ছড়ায় দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুমের অনুবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে Diddle-diddle-boom। অথচ জিভ ঘুরিয়ে টাকরায় ধাক্কা দিয়ে 'দ'য়ে চন্দ্রবিন্দু আর 'ড়'য়ে শূন্য বলতে ড়' যে মজা, Diddle-diddle-boom তার পরিবর্তে নেহাতই জোলো লাগে।

Super Beast ("কিম্ভূত") কবিতায় সুকান্ত 'গোসাপকে' যে কেন lizard বানিয়েছেন তার কোনো যুক্তি নেই। এখানে gecko লিখলেও ছন্দের পতন ঘটত না।

"ছায়াবাজি" (Shadow Play) ছড়ায়, চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পার, / শুঁকলে পরে সর্দি কাশি থাকবে না আর কারো।—এই 'যদি'র ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সুকুমারের জগৎটা এই 'যদি'র ভিত্তি-তেই দাঁড়িয়ে আছে। অনুবাদে সুরটা বড়োই সচেতন, এখানে আর 'হয়তো' বা 'যদি'র স্থান নেই। অথচ পাশা-পাশি দেখি Pumpkin Puff (কুমড়ো পটাশ) ছড়ায় 'যদি'র ব্যবহার সর্বত্র। এই বৈপরীত্য কেন? Doctor Deadly-তে (হাতুড়ে) সুকুমার হাতুড়ে ডাক্তারকে হাতুড়ি ব্যবহার করিয়ে-ছেন। যেখানে সুকুমার লিখেছেন : 'হাতুড়ির একঘায়ে একেবারে আটকা'। সেখানে সুকান্ত লিখেছেন : They just need a touch of my versa-tile hands. এই versatile hands এর মধ্যে হাতুড়ে ডাক্তারের হাতুড়ির কষাঘাত নেই। যদিও অন্যত্র (এই ছড়াতেই) সুকান্ত বলেছেন A rap with a hammer is just what you need.

Safety First ("সাবধান") ছড়ায় 'চাম্নির বাজার' অর্থ চাঁদনি চকের ঘিঞ্জি বদ্ধ বাজার—open bazar নয়।

The Power of Music-এ ("গানের গুঁতো") 'The people, dazed, retired amazed although they know it's well-meant' অন্তঃস্থ ছন্দ অনুবাদকে সমৃদ্ধ করেছে, কিন্তু "they know it's well-meant" সুকুমার একবারও ব্যবহার করেন নি। এটা ছন্দের খাতিরে ভাবপরিবর্তনের আর-এক দৃষ্টান্ত। Tickle-My-Ribs ("কাতুকুতু বুড়ো")-তে......কচুর গায়ে রং-বেরঙের আল্‌পনা সব আঁকা হয়ে যায় "The yams all painted with colourful scrawls"। এই অনুবাদে nonsense elementটা কিছু হ্রাস পায়। কচুর গায়ে হিজিবিজি আঁকা (scrawls)-এর থেকে সুষ্ঠু আলপনা আঁকা কি আরো কিম্ভূত-কিমাকার নয়? আর আলপনার এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে অনু-বাদক ফুটনোট ব্যবহার করলে বোধহয় তাঁর প্রয়াস আরো সার্থক হত। "ট্যাঁশ-গরু" ছড়ায় ট্যাঁশ শব্দটি ব্যবহারের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে—কোনো এক শ্রেণীর মানুষকে উদ্দেশ্য করে সুকুমারের এই ছড়া, তবে লক্ষণীয় যে কোনো রকম বিদ্বেষপরায়ণতা বা ব্যঙ্গ নেই। সুকান্ত চৌধুরী এই সুরটি পালটান নি অবশ্য তবে নামের অনুবাদে ব্যর্থ হয়েছেন। ট্যাঁশ গরুর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত স্যাটায়ার পাই, The Blighty Cow নামে তা পাওয়া যায় না।

'হ-য-ব-র-ল' র (The Topsy Turvy Tale) অনুবাদে সুকান্ত অনন্য। এই 'ফ্যানটাসি' ইংরাজিতে যেন এক স্বাধীন সত্তা পেয়েছে। হিজবিজ হয় Higgle Piggle Dee (সত্যজিৎ রায়ের নামকরণ) এবং এই ধরনের নামকরণ-গুলি nonsense rhymeকে এক নতুন আঙ্গিকে পৌছে দেয়। বিজ্ঞাপনের অনুবাদটি সম্পূর্ণরূপে সার্থক।

প্রকাশন-সংস্থা এই অনুবাদকে যে উৎসাহ দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। নিঃসন্দেহে সুকুমার রায় এর দ্বারা আরো পরিচিত হবেন অনেক বেশি-সংখ্যক পাঠকের কাছে। সুঠাম, ছিমছাম ঝকঝকে বইটি যেকোন বইপ্রেমিকের সমাদরের বস্তু। সত্যজিতের ভূমিকা এবং সুকুমারের নিজের হাতে আঁকা চিত্রগুলি গ্রন্থ-টিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

প্যামেলা সরকার

বজ্রগর্ভ বাকস

তন্ময় দত্ত

মিডিয়ার মুনি মারশাল ম্যাকলুহান লিখেছিলেন গিউটেন-বার্গ-নীহারিকার কথা, অর্থাৎ ছাপার অক্ষরের ছত্রাকার জগৎ, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন ছাপাকলের আবিষ্কর্তা যোহান গিউটেনবার্গের নামে ; গত পাঁচশো বছর ধরে আমরা সবাই যে-নীহারিকার নাগরিক। শুধু এমন এইটুকু নয় যে ওই 'হলদে-ম্লান বইয়ের পাতার লুকোনো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকার' বুদ্ধদেব বসু এবং অনুরূপ বিরল মানুষদের গর্ভের যত্নে লালন করে। অনেক ব্যাপক-তর ব্যাপার এই যে, কথকতার সংস্কৃতির শেষ হয়ে গেল ওই আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গে ; শুরু হল গণমাধ্যমের যুগ, যা তার স্রষ্টার চেয়ে শক্তিমান। চারদিকের ওই খুদে, কালো অক্ষরের পিলপিল, ধ্বনি, অর্থ প্রতিটি সাক্ষর লোকের প্রতি মুহূর্তের জীবনকে উৎকর্ণ করে : পুঁথি আর শ্রুতির গণ্ডিবদ্ধ যুগে যেমনটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। ম্যাকলুহানের মতে, মুখোমুখি, স্বকর্ণে, চাক্ষুষ শেখার যুগে এক মৌখিক সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল। সেসব সরিয়ে মুদ্রিত মাধ্যমের ঋজুরেখ অক্ষৌহিণী—বই, বিজ্ঞাপন, পোসটারের পিঁপড়ে—তৈরি করল এক চোখনির্ভর অপ্রত্যক্ষ সংস্কৃতি। করেছিল ; কেননা ইতিমধ্যে এসে গেল বাড়িতে বক্তা বেতার, রঙ্গালয়ে উদ্ভাসিত চলচ্চিত্রবাণী এবং, সব-শেষে, অন্দরমহলে, কুলুঙ্গিতে, নীলাভ আলোর বাকস, টেলি-ভিশন কল : যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলি মিলে, সাহেবের মতে, নীহারিকাকে ক্রমশ নিভিয়ে আনছে আজ। অক্ষরনির্ভর চাখন-সংস্কৃতিতে এতাবৎ-প্রবাসী মানুষকে এইসব চাখন-যন্তর নাকি ফিরিয়ে নিয়ে আসছে আবার আদিবাসিতায়, সামনে উপস্থিত মানুষের গলা আর গতর যখন খালি ভাব-বিনিময় করত। আরো, এইসব নতুন যন্ত্রের আভায় পৃথিবী নাকি ক্রমশ এক পাড়াগাঁ হয়ে দাঁড়াবে, দাঁড়াচ্ছে ; অর্থাৎ অ্যারিজোনা থেকে আনন্দবাজার অবধি সবাই নাকি একই সময়ে একই ঘটনা নিয়ে কুচ্ছো করবে ক্রমশ : রাধার ঘরে চুড়োবাঁধা এক মিনসে! ম্যাকলুহানের মরমি থিসিস আরো এইরকম ছিল যে কোনো মাধ্যমই নিষ্ক্রিয় বা নিরপেক্ষ নয় : যে বার্তা তাদের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাকি মাধ্যমগুলির নিজস্ব সাংস্কৃতিক বোলচাল : মাধ্যমই নাকি মোদ্দা কথা। অক্ষরের দৃশ্য নাকি তার অর্থের অধিক, বিজ্ঞাপনের আঘাত বেশির ভাগ সময়েই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন : এবং বেতার, বায়োস্কোপ বা টেলিবাকস তাদের ব্যবহারকারীদের এই শর্তে রাজি করায় যে তারাই বক্তার বাণী। প্রায় সিকি-শতাব্দী আগে প্রচারিত এবং উত্তেজক এইসব তত্ত্বকথার জনক ম্যাকলু-হানসাহেব কিন্তু গণমাধ্যমগুলিকে গাল দেওয়ার জন্য আলোচনায় নামেন নি : অক্ষরনির্ভর সাহিত্যাদি, পথের মোড়ের পোসটার সিনেমা, বায়বীয় বেতার, টেলিভিশনের চিত্রভাষ ইত্যাদিকে তিনি দেখেছিলেন সমাজের উচ্চাবচ এগোনোর পথের ঘটনা হিসেবে। তাঁর নিস্পৃহ বক্তব্য ছিল, এইসব মাধ্যমগুলি বিভিন্ন ভাবে, ক্রমান্বয়ে আমাদের বেঁচে-থাকাকে পালটাচ্ছে ; এবং আমরা যেন জ্ঞাতসারে পালটাই। অবশ্যই সাহেবের এই ফতোয়া সবগুলি কিছু বেদবাক্য নয়। নানা অভয় ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করে গেছেন, যেমন বইটই উঠে গেল বলে ; এবং অনেক খামখেয়ালি

সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য

সিদ্ধান্ত, যথা টেলিপ্রচার ছাড়া ভিয়েতনাম যুদ্ধ লড়া সম্ভব হত না ; যাদের উচিত উত্তর হতে পারে কেবল বাঙাল বিধবা বুড়ির আত্মবিশ্বাসী অবজ্ঞার এককথায় : হ।

পালটানোর রকম আলোচনা করতে গিয়ে ম্যাকলুহান সাহেব বারবার তুলেছেন টেলিপরদার কথা ; যে নাকি কোনো বার্তাবিনিময়ের মাধ্যম নয় একেবারেই : নিজেই মূল বার্তা। চাক্ষুষ বক্তা আর আদেখলে শ্রোতার মাঝ-খানের নিরপেক্ষ মাধ্যম নয় ওই যন্তর ; অন্দরমহলে, মুখোমুখি, মুখভঙ্গিসহ বক্তাকে হাজির করে ওই যন্ত্র এমন এক অভিঘাত আনে যা সব বক্তব্যের অতীত, অধিক ; বস্তুত সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী। বোকামোর বাকস, ফ্যালফ্যাল-তাকিয়ে থাকার, সভ্য আলাপচারীর শত্রু বাকস ইত্যাদি বাপান্ত করা হচ্ছে পশ্চিমে ওই যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রায় তার চালু হবার শুরু থেকেই ; এবং এই মাধ্যমের যারা মস্তান, ক্রমশ মাননীয়, খেলুড়ে তাদের বিজ্ঞসমাজে গণ্য হবার চেষ্টার বিরুদ্ধেও প্রথম থেকেই খুব চেঁচামেচি ছিল। তা সত্ত্বেও, বা সেইজন্যই, ওই যন্ত্র পশ্চিমের প্রায় প্রতি পরিবারেই আজ (যেমন পঁচিশ বছর আগে ম্যাকলুহানের সময়েও ছিল) এক অতিরিক্ত এবং অপরিহার্য সদস্য ; এমন একমাত্র সদস্য যে সমানে, সারাদিন, সঙ্গ দেয়, অক্লান্ত বকে, নাচে, কোঁদে, অথচ মনোযোগের জন্য অনুযোগ করে না ; একঘেয়ে ঘরের মধ্যে হরেক মজারু। ম্যাকলুহানের বিশ্লেষণ এইরকম ছিল যে, এই নতুন নওটঙ্কির ভালো নট খালি তারাই যাদের মুখভাব, গলার স্বর আর ভঙ্গি ঘরে উপস্থিত মানুষের মতো নীচু পরদার, মানানসই, সুসমঞ্জস : ঘরের মাঝে যারা উত্তেজিত চেঁচায়, নানা ঝামেলার বিতণ্ডা তোলে এমন মানুষকে কি আমরা একবারের অধিক নেমন্তন্ন করি ? সেইজন্যই পুরোনো হিসেবে যারা ঝোড়ো বাগ্মী, তারা এই যন্ত্রের নিরিখে ফেল। ম্যাকলুহানের নিয়মে তারাই এই কলের কেরামত যাদের মুখ অকৌণিক, বাচন নির্বিবাদী এবং বক্তব্য ঠিক সেই তরলতার যা এ-কান দিয়ে ঢুকে চকিতে ও-কান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। নাগরিকদের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলবার সুযোগদাতা এই যন্ত্রকে (কোনো অসরল কথা না-বলার শর্তসাপেক্ষে) কোনো রাজনীতিকই প্রধান অবলম্বন না মেনে পারেন না ; যেমন পারে না বিক্রির জন্য হন্যে যে-কোনো ব্যাবসা ; অনুরূপ আবেগে মরিয়া নানা মান্যগণ্য মানুষ। ম্যাকলুহান লিখেছিলেন, ষাট সালের নির্বাচনে রিফুজি আইরিশ জাতির আর সংখ্যালঘু ক্যাথলিক ধর্মের হয়েও কী করে জন কেনেডি মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের পতি নির্বাচিত হন, রিচার্ড নিকসনকে এক চুলের জন্য হারিয়ে, শুধুমাত্র ওই যন্তরকে যথাযথ ব্যবহার করার ফলে। ওই অপ্রত্যাশিত জিত, তাঁর মতে, সম্ভব হয়েছিল কেনেডির মধুবদন আর বাচনভঙ্গির জন্য শুধু ; বক্তব্য অবশ্যই ছিল গৌণ এবং অচেনা মানুষটা আসলে কী বলতে-করতে চায়, এসব গড়বড়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে নি। আরো পরে অন্য রিপোর্টে পড়া গেছে, আট বছর পরের নির্বাচনে নিকসন দেখিয়ে দেন ওই যন্ত্রের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে নামার ফল কী : বিপুল ভোটে জেতেন তিনি ; জেতার আগে তাঁকে চুলকাটার ছাঁট পালটাতে হয়েছিল। 'তোমার বাঙ্ময় দৃশ্যই তোমার বাণী' টেলিযন্ত্রের এই অকাট্য আইন সমাজের ভালো কি মন্দ করে, সেই আলোচনা অবশ্যই এখানে করা হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শুনেছি, পাঁচ দশকের আমেরিকার উপরমহলে যিনি শ্রদ্ধা আর ত্রাসের আধার ছিলেন, সেই কুখ্যাত কমিউনিসট-দ্বেষী সেনেটর ম্যাকারথিকে ছ মাসে মর্কট বানিয়ে দেয় এই বাকস : তাঁকে ঘরের কোনায় এসে কুশ্রী বকতে দেখার সুযোগ পেয়েই লক্ষ-লক্ষ নাগরিক তৎক্ষণাৎ ধরে নেয় যে তিনি একটি বিকৃত বুদ্ধু।

ম্যাকলুহানের তত্ত্ব প্রচারিত হবার পরের পঁচিশ বছরে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে একটি ছোটো, পয়সাওলা লোকে-দের পাড়াগাঁ তৈরি হয়েছে ঠিকই : পশ্চিমের আহ্লাদ উপগ্রহ ঠিকরে একই সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের কিছু-কিছু প্রাসাদে পৌঁছুচ্ছে বই-কি। কিন্তু ওই ঘরের কৌটোর আন্তর্জাতিক আভায় ক্রমশই আমাদের এতদিনের গিউটেনবার্গ গ্যালাকসি ম্লান এবং অবান্তর হয়ে আসবে, বইটই পড়া ক্রমশ কিছু বিশেষজ্ঞ লোকের বাতিকে পর্যবসিত হবে—ম্যাকলুহানের এই ভবিষ্যদ্বাণী খেটেছে, বা খাটবে, বলে একেবারেই মনে হয় না। প্রায় পঞ্চাশ বছর টেলিভিশন চলতে থাকার পরেও পশ্চিমে রাশি-রাশি বই বেরুচ্ছে রোজ, ম্যাগাজিন-সংবাদপত্রের শেষ নেই, জনপ্রিয় নবেল-টবেলের নাকি কোটি-কোটি বিক্রি রদ্দি বাঁধুনিতে : জীবাণুর সংসারের মতো অফুরান মনে হয় আজো মুদ্রিত মাধ্যমের জগৎকে। শুনতে পাই অবশ্য, পশ্চিমী শিক্ষাদীক্ষার জগতে এক বড়ো সমস্যা ইশকুলপাশ, এমনকি স্নাতক ছাত্রছাত্রীর প্রায়-নিরক্ষরতা। পড়া, লেখা এবং কষার উপর নির্ভর যে জ্ঞানগম্যির ব্যাপার আমাদের নীহারিকায় এতদিন চালু ছিল, তার জায়গায় এসেছে কান পেতে মুগ্ধ দেখার আশৈশব অভ্যেস ; এবং, ফলে, নাকি অক্ষরের সঙ্গে অনাত্মীয়তা, প্রতি অপ্রীতি। একটি পুরো প্রজন্ম পশ্চিমে সাবালক হয়েছে এমন এক আবহে যেখানে ঘরের মধ্যে সকাল থেকে মাঝরাত অবধি নানা নটের আনাগোনা : শুধু ইয়ারকিরঙ্গ করে না তারা, কেউ গম্ভীর ভাষ্য বলে, কেউ সাহিত্যকার, কেউ গলা খেলায়, কেউ ফুটবল। এই বৈচিত্র্যে যারা বড়ো হয়েছে তাদের সঙ্গে পুরোনো নীহারিকার মায়া নিশ্চয়ই তেমনটা জমে নি, যেমনটা টেলিবাক্সের আগের যুগে ছিল। কিন্তু লক্ষ করার বিষয়, আগের দিনের তুলনায় বইপত্রের বিক্রিবাটা আসলে বেড়েছে, সবদেশেই। এমনও দেখা যাচ্ছে এদেশেও, কিন্তু বিশেষত পশ্চিমে, যে টেলিকলের প্রচারের সাহায্যেই প্রতিযোগী মুদ্রিত মাধ্যমের বিকিকিনি বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, সফল চেষ্টা। আসলে অবকাশ এবং ওই সম্পর্কে হতাশী এমন মানুষের সংখ্যা বোধহয় সর্বত্র বাড়ছে। তা ছাড়া অবকাশরঞ্জক মাধ্যমগুলি সবই বৃহৎ ব্যাবসার অন্তর্ভুক্ত ; যারা কেউই বেঘোরে মরে যায় না ; দরকার-

মতো ভোল পালটে বিক্রি বজায় রাখবার এবং বাড়ানোর চেষ্টা করে।

টেলির ছোটো পরদা ঘরে আসার আগে বাইরে এসেছিল ধাড়ি পরদা, সিনেমা, বাকশক্তি পেয়ে যার খোলতাই হয়। কোটির ঘরে কাটতি যেসব একালীন বিলিতি বইয়ের, সরস সাংবাদিকতার বই—যেমন, উদাহরণস্বরূপ, ধরুন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভালো ভাষ্যকার করনেলিয়াস রায়ান বা হালের জোড় লাপিয়ের-কলিনসের বইপত্তর—তাদের সাজানোই হয়েছে সিনেমার সশব্দ দৃশ্যের পরিবর্তমান অভিঘাতে অভ্যস্ত ভোক্তার সুবিধের দিকে চোখ রেখে।* ছাপা বিবরণের এই সিনেমাটিক প্যাঁচের পিতা বোধহয় মারকিন দেশের "টাইম" পত্রিকা (যা এই পোড়া জন্মভূমিতে সাংবাদিকতার আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত, এমনকি তার সাইজ আর সাজসজ্জাও)। গল্প আছে যে, মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক-রাজনীতির এমন কোনো বিতর্ক কখনো ঘটে নি যে-সম্পর্কে ওই পত্রিকার সম্পাদকীয় বক্তব্য উলটো বোঝায় নি রামকে; এবং যার সামগ্রিক চরিত্র নাকি শুরু থেকেই ছিল, আজও যেমন, সবচেয়ে হালফ্যাশনের, সবচেয়ে শূন্য মস্তিষ্কের: সজ্জিত, গর্বিত গবেট। এগুলি যদি নিছক হিংসের বা রাগের গাল নাও হয়, তাহলেও ভোলা যায় না দ্রুততর মাধ্যমগুলির সঙ্গে পাল্লা রেখে ছাপা মাধ্যমকে কীরকম নটবর বনতে হবে তা হয়তো ও পত্রিকাই নিজেকে বদলে সকলকে প্রথম বোঝায়। লক্ষ করলে দেখা যাবে, সিনেমা যেমন সময়াভাবে কোনো ভূমিকাটুমিকা না করে হঠাৎ কৌতূহল উশকিয়ে নিজেকে শুরু করে, অবিকল ওই আচমকা ভঙ্গির নকলে পত্রিকার নিবন্ধগুলির প্রস্তাবনা ("One afternoon last week, the first silent flake of snow fell on Moscow": ১৯৪১ সালের "টাইম" পত্রিকার এক নিবন্ধের শুরুর লাইন; বিষয়, রুশী হিমঋতু পোহাতে পারবে তো হিটলারি বাহিনী? আমাদের দেশের ইংরাজি সাংবাদিকতায় হালে এই সিনেমাটোগ্রাফিক গন্ধের চালু হয়েছে "টাইম" পত্রিকারই নকলে। খবর বাতলাতে গিয়ে খবরের নায়কের চেহারা আর পোশাকের বর্ণনা করার কায়দাও, সিনেমার দৃশ্যের ধাক্কার নকলে, এই পত্রিকা শুরু করে। আরো: অন্য মাধ্যমে অভ্যস্ত এবং মুগ্ধ মানুষ যে অক্ষরের দ্বারা উত্ত্যক্ত বোধ করতে পারে, এই নতুন তথ্য অক্ষরনির্ভর মাধ্যমের যে ব্যবসায়ীরা প্রথম চটপট বুঝে নিয়েছিল তাদের পথিকৃৎ আর প্রেরণা "টাইম" পত্রিকা এর পরে "লাইফ"পুনরুজ্জীবিত করে। ছবিওলা পত্রিকা আগেও অনেক ছিল। কিন্তু একটি ছাপা পাতা কিভাবে অক্ষরের একহারা, একঘেয়ে গাঁথনিতে অনভ্যস্ত, অনুৎসুক মানুষকে গছাবার জন্য সাজানো হবে, ক্রেতার চোখকে কী করে অক্ষর থেকেই আরাম দেওয়া যায়—এই উদ্বেগ আজ সর্বত্র বহুবিক্রি সাময়িকীদের চেহারা পালটাচ্ছে। মুদ্রিত মাধ্যমের মসীজীবী ঢঙ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে যার ফলে অনেক সাময়িকী: চিত্রিত, চিৎকৃত ট্যাবলয়েড-এর উদয় যে-কারণে। ওই ঢঙ বজায় রেখেও হাতে-গরম গন্ধভঙ্গি এবং আধা-নিরক্ষর পাতা কিভাবে আপামরকে টানতে পারে তার উদাহরণ দেখায় "লাইফ"। (সিনেমার প্রভাবে ছাপা পাতা কী রকম থলবলে হয়ে ওঠে তার উদাহরণ হিসেবে ওই দুই নামি আর বিক্রিদার পত্রিকার উল্লেখ এই কারণেও বটে যে আমাদের দেশে ওই দুই কাগজ, দামি আর ইংরাজি ভাষার যেহেতু, অনেক-পাশ ও-আয়ের মানুষের কাছে খুব সম্মানের। মনে পড়ছে, ১৯৬২ সালে, সেই দারুণ চীনযুদ্ধের সময়, রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের স্বাধীনতাদিবসের আগের সাঁঝের ভাষণে ছিল সেই সপ্তাহের "টাইম" থেকে অনেক অস্বীকৃত উদ্ধৃতি: ওই বুকনি রচার ভার যাঁর উপরে ছিল, সেই বড়োকেরানির বিদ্যে আর রুচি ছিল ওইরকমের)।

ছাপার জন্য আঁকা ছবি, ফোটোগ্রাফ মুদ্রিত মাধ্যমের আবশ্যকীয় অলংকার। সিনে-মাধ্যমের ধাক্কা ছাপা পাতায় কেমন এসে ঠেকেছে বোঝার জন্য আগের দিনের ছবি-সাঁটা-আঁকা পাতা আর একালের চিত্রিত পাতার তুলনা আরেকভাবে করা যেতে পারে: বিজ্ঞাপন। আবেদন বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞাপনকে সচিত্র বানানো খুবই পুরোনো নিয়ম। কিন্তু, আমাদের দেশের কাগজেই, তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের বিজ্ঞাপনের সচিত্র শোরগোল আর একালের নানা রঙের (বা এক রঙেরই) বিজ্ঞাপনের শোভার তফাত শুধু এই নয় যে সাধু বাঙলার জায়গায় এসেছে কথ্য বাঙলা, ছাপার যান্ত্রিক জেল্লা অনেক বেশি এখন। লক্ষ করলেই দেখা যাবে ভাষার বেগে, ছবির স্থাপনায়, মডেলের মুদ্রায় এমন একটি চলমানতা আনার চেষ্টা করা হচ্ছে যা সিনেমা ব্যাপক চালু হবার আগে স্থাণু মাধ্যমের আক্কেলের অতীত ছিল। আগ্রহীরা নিশ্চয়ই এও লক্ষ করেছেন যে অন্য মাধ্যমের প্রভাবে, হাতে আঁকা ছবি বিজ্ঞাপন থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছে।

এমন অবশ্যই নয় যে ঢাউস পরদার, সিনেমার, অভিঘাত শুধু ছাপার জগৎকে তুর্কি নাচিয়েছে: জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও তার প্রভাব আছে বই-কি (সিনেমার আলোচনায় অবশ্যই সেইসব সিনেছবির কথা ধরছি না যারা শিল্পকর্ম পর্যায়ের; কেননা এগুলি সংখ্যায় আর মোহনে কমজোরি)। সিনেমা: অর্থাৎ এক আলোকিত, আরামদায়ক আনন্দমেলা, বহুজন সেজে উপস্থিত; অঙ্গন আঁধার হয়ে আসে, পেল্লায় পরদা জুড়ে দশাসই আর অসাধারণ রূপের মানুষমানুষীরা অবতীর্ণ হয়; আমাদের চেনা জীবনেরই এমন এক বহুবর্ণ জমকালো সংস্করণ ঢ্যাম-কুড়-কুড় করতে থাকে যার দ্বারা প্রত্যেকে আত্মবিস্মৃত; যতক্ষণ না আলো জ্বলে; এবং জ্বলার পর, সঙ্গমোত্তর লঘুতার সঙ্গে, সবাই বাড়ির পথে হাঁটে। জাগরূক সময়েও সিনেমার নটনটীদের নিয়ে নিশ্চয়ই স্বপ্নচারণ চলে; কিন্তু কিছু কাঁচা বা বাতুলকে বাদ দিলে আমাদের রোজকার টিমটিমে জীবনকে ওই আঁধারের আলো সোজাসুজি জোরালো করে তোলে না। ফিলমপত্রিকা, কেচ্ছাকলম, অটোগ্রাফের জন্য আতান্তর এইসব স্মরণে রেখেই বলছি, সুগন্ধে হিম হলের আলো-নেবা-ও-জ্বলার মধ্যে আবদ্ধ সিনেমার ভূমিকা, বইপত্রের তুলনায়, আনুষ্ঠানিক আর ঘড়ি-বাঁধা: সকলেই যেন জানি, ও এক আধিভৌতিক জগৎ, দূরের, অন্যরকম, স্বপ্নের মইয়ের শেষ ধাপ। বাড়ির বাকসবন্দী পরদাতেও অবশ্য ধেড়ে পরদা থেকে ধার-করা সিনেমা দেখানো হয়, সেই চেনা গল্পের গোরু কল্পতরু গাছের আগায় আসীন; তবু বড়ো-সিনেমা কিছুতেই বেঁটে-পরদার দ্বারা বাতিল হল না হয়তো এই কারণে যে ঘরে মোহগ্রস্ততার, আত্ম-

* লাপিয়ের-কলিনসের 'ইজ প্যারিস বার্নিং' বইয়ের শুরু (শটই বলা উচিত): He was never late. Each evening, when the German arrived with his old mauser, his frayed leather binocular case, his dinner pail, the inhabitants of the village May-en-Multien, knew it was six o'clock. As he walked across the cobbled town square, the first notes of the evening Angelus invariably rang out from the Romanesque belfry of the little twelfth ceutury church of Notre-Dame-de' Association looking down on May-en-Multien's grey slate roofs from its perch on a ridge over the River Ourcq, thirty-seven miles northeast of Paris: ক্যামেরা প্যান করছে, পিছু-পিছু কলম। একাই-একশো দমিনিক লাপিয়ের "সিটি অব জয়" নামে হালে একটি রহস্যময় বই লিখেছেন, তার টাইট্‌ল্‌-শট: He had the appearance of a Mogul warrior: thick shock of curly hair, sideburns which met the drooping curve of his moustache, a strong, stocky torso, long muscular arms and slightly bowed legs. শুরুতেই আচম্বিতে উপস্থাপিত এই he কে, কেন তার শক্ত খাটো গড়ন, লম্বাটে পেটাই হাত, ধনুক পা? সিনেমায় অভ্যস্ত পাঠকের জন্য এই রগড়ের প্রস্তাবনা। গুণিতর লেখক করনেলিয়াস রায়ান-এর "এ ব্রিজ টু ফার" বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ('দি প্ল্যান') শেষ দুই বাক্য: "On the mirror above the fireplace in the sergeants' mess, now empty, there was one last notation, scrawled before the men became too busy to bother. It read '2 minutes to go…no Cancellation.' " অব্যবহিত পরের পাতায়, অধ্যায়ের ('দি অ্যাটাক') শুরুর বাক্য: The thunder of the huge formations was earsplitting. বইয়ের বিষয় হল্যানডে গত মহাযুদ্ধের সময় বিশাল বিমান-আক্রমণ। সবাই তৈরি প্রভাতে আকাশপথে ধাওয়ার জন্য, ব্যারাকে রাত্রিশেষের জনশূন্য খাবার ঘর, আয়নায় লেখা আঁকাবাঁকা শেষ বার্তা, এবং—কাট টু—পরদা জুড়ে কড়কড় শব্দে এরোপ্লেনের স্রোত! গম্ভীর সাংবাদিক-ঐতিহাসিক থিওডোর হোয়াইট এর "দি মেকিং অব দি প্রেসিডেনট ১৯৭২"-র প্রথম লাইনে লংশটে চীন মহাদেশ: I could see the fan of yellow water below shortly before the plane dipped into the overcast. We were coming in on China. প্লেনের অন্দর, জানালা দিয়ে অভিনিবিষ্ট দর্শক-লেখকের মুখ, নীচে অপস্রিয়মান নদী, জমি; মেঘলা আকাশে ডুবে প্লেন আবার বেরিয়ে এল, বিখ্যাত উপমহাদেশ তলায় সরে-সরে যাচ্ছে। পরের বাক্য থেকে ফ্ল্যাশব্যাক শুরু হয়েছে ওই বইতে।

বিস্মৃতির পরিকল্পিত পরিবেশ জোটে না। এইরকমটা বিদেশে ; নিজেদের দিকে ফিরে এলে কী দেখি ?

আমরা এমন এক সময়ে, দেশে, আত্মভোলা অনটনের মধ্যে ছোটো ছিলাম আর বড়ো হয়েছি যখন রেডিয়ো (ধারাবিবরণী ! অনুরোধের আসর !! শুক্রবারে নাটক !!!) ব্যাপক হচ্ছে মধ্যবিত্ত সংসারে (পরে ভগীরথের মতো ট্রানজিসটর আসবে) ; ছাপার অক্ষরের নক্ষত্রবীথি নিশি ডেকে চলেছে দিবসেও ; এবং সিনেমা ছিল যৌনতার প্রতীক। শেষের কথাতেই ফিরে আসি ; মেরিলিন মানরো বা সোফিয়া লোরেনের বুকের উচ্ছ্রিত আধো-চাঁদ পরদায় পাঁচফুট জুড়ে হাঁ-দেখার আমোদ (এবং কষ্ট) সহজলভ্য হয়েছিল কোমরে পুরো পাতলুন আর হাতে খুচরো (টিউশানির) আসার আগে নয়। সিনেমার প্রতি ঘোর আমাদের বিকচ যৌবনের, উদীয়মান যৌনতার সঙ্গে সমার্থক ছিল এই কারণেও যে ওই আনবাড়ির পরদা ছিল ঘরের বদ্ধতার বাইরে : পারিবারিক আঠা, যৌথ মশারি ছিঁড়ে আমরা যে-সমস্ত উন্মুক্ততায় উঠতে চাইছিলাম তারা ছিল খেলার মাঠে বৃষ্টিভেজা লাইন, সিনেমার একলা-করা অন্ধকার, বইয়ের ব্রহ্মাণ্ড এবং, অবশ্যই, সমবয়সিনীরা (ছিল না)। হয়তো এই কারণেই আমাদের পুরুষ পরদানশিন রেডিয়োতে অভ্যস্ত হতে পারে নি। বাঙলা পরদার নতোদর নায়ক এবং রূপ ও (অমৃতে গোমূত্রের ন্যায়, যদিও একবিন্দু নয় একেবারেই) আধো-স্বরের নায়িকা যতোই কার্ডবোর্ডের সঙ হোক, সেদিন আমাদের বখে যাবার শখের ন্যাঙ্গাত ছিল। ফলে নাতিস্থূল নটের নকলে পরিচিতকে ঘাড় কামিয়ে আনতে দেখেছি, চুলের চূর্ণ কানের সামনে দিয়ে নিষিদ্ধ গালে দোলাতে বান্ধবীকে। এতদিন পরে মনে হয়, গত তিন যুগের বাঙলা সিনেমার সামাজিক প্রভাব দরজি-নাপিতকে পোহাতে হয়েছে শুধু ; এখন অন্য ভাষার বেশি-উদ্যমী সিনেমার দাপটে বোধহয় এটুকুও নয় : অর্থাৎ বাঙলা ভাষার সিনেমা যথেষ্ট জনপ্রিয় মাধ্যম হতে পারে নি। নিরক্ষর কিন্তু মৌখিক সংস্কৃতিতে ধনী দেশে সিনেমার ভূমিকা কীরকম বাড়বাড়ন্ত হতে পারে তার উদাহরণ শুধু দক্ষিণের নট-শাসিত রাজনীতি নয় : পয়লা উদাহরণ দুনিয়ার বৃহত্তম বিনোদ-উদ্যোগ হিন্দি সিনেমা।

আমাদের দেশের রাজনীতি-সংস্কৃতিতে একসময় হিন্দি-বিরোধিতার খুব বড়ো ভূমিকা ছিল : কত খুন, খারাপি, তর্ক এই নিয়ে! সব বক্তাকে উজবুক বানিয়ে এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করে হিন্দি সিনেমা ; সারা ভারতবর্ষে যার পাগল-করা চল, সেইসব ছবির ভাষার বিরুদ্ধে লড়াই একদিন আপনিই শুকিয়ে এল। বস্তুত ভারতবর্ষকে এক রাখার ব্যাপারে এক অলক্ষিত অবদান হিন্দি সিনেমার (আর ওই সিনেমার গানের)। রেগে বলা যেতে পারে, আমরা আমাদের কুরুচির দ্বারা একত্রীকৃত। কিন্তু ধর্ম বাদ দিলে এই বোধহয় একমাত্র জিনিস যা শহর থেকে শেষ গাঁ অবধি বিস্তৃত ; খুব যে ধনী এবং তার দরোজায় যে ধরনাদাতা তাদের আমোদের তেষ্টা একই জিনিস মেটায় ; দিল্লির কূট কাছারির প্রচণ্ড গোমস্তা এবং দক্ষিণের এক দূর গাঁয়ের দধীচি গাড়োয়ান এইখানে প্রত্যক্ষে পঙক্তিভোজ করে। ফলে, যে ভাষা বাধ্যত শেখা নিয়ে এত বচসা, তা সবাই একদিন আপনিই মুগ্ধ মেনে নিল। তিনভাষার ফরমুলা পাঠশালায় যখন সরকারি নির্দেশে চালু করার কথা হয়, তাই নিয়ে শুধু সাম্প্রদায়িক প্রতিবাদ নয়, আন্তরিক সংশয়ও ছিল : ছেলেপুলেরা পারবে তো ? সিনেমা আর লাউডস্পিকারের তালে-তালে তারা যে অবলীলায় পারল তার এক প্রমাণ হয়তো আজ যারা সদ্য-যুবক তারা সবাই উর্দুখচিত গজলের সমঝদার। কিছুদিন আগের সরকারি হিন্দি সপ্তাহ নিয়ে যে বিরোধী হইচই হয়ে গেল, তা তামিলনাডু ছাপিয়ে অন্যত্র পৌঁছায় নি ; ওই প্রদেশেও প্রতিবাদের বেগ এসেছিল স্থানীয় রাজনীতির দাবিতে। এক সাময়িকীর সমীক্ষায় প্রকাশ, প্রতিবাদী মন্ত্রীসান্ত্রীর ছেলেপুলেরাও নিয়মিত হিন্দি চর্চা করে থাকে। যা প্রকাশ হয় নি তা হয়তো এই যে সাধারণ মানুষের স্বপ্নের আধারের ভাষার চর্চা চব্বিশ ঘণ্টা ধরে চলে, স্মরণে, বিড়বিড় উচ্চারণে, বেসুরো ব্যাকুলতায়, জবাবহীন নটের নকলে : যা ছাড়া কিছুতেই দিন কাটে না সেই দিবাস্বপ্নের রাষ্ট্রভাষা এখন হিন্দি।

হিন্দি সিনেমার প্রভাব সম্পর্কে আরো কতকগুলি অনুমান আলোচনা করা যেতে পারে। আমাদের অল্প বয়সে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়েদের পোশাক দেখে পিতার আয় সবসময় ঠিক ঠাওরানো যেত না। ওই-সব পিতারা কেউই বুনো রামনাথ ছিলেন না ; অসাধু রোজগারের কমতি ছিল না ; কিন্তু উদ্বৃত্ত পয়সা কিভাবে খরচা করা হবে সেই সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণাগুলি অন্যরকম ছিল। শিশুবয়সে ধনী বাড়িতেও দেখেছি বিজলী বাতি থাকলেও পাখা ছিল না, মোটরগাড়ি ছিল না, বাড়িতে অগুনতি নিষ্কর্মা আত্মীয় ছিল, পুজোর সময় এক দরজিতে এক ছিটের (যেমন চুল কাটার সময় এক নাপিতে, লাইন ধরে, একই ছাটে) ডজন ধরে জামা বানাত। নানা অপরিচ্ছন্ন অভ্যাস, মেয়েদের প্রতি দুর্ব্যবহার, মুসলমান আর ছোটো জাতের জন্য ভাঙা থালা, অস্বাস্থ্যকর আঁতুড়ঘর, টোটকা চিকিৎসার দ্বারা শিশুহত্যা —এগুলিও ওই একই জীবনধারণার অঙ্গ টুকরো ছিল। এই ধারণাগুলি গত তিরিশ বছরে সম্পূর্ণ বদলেছে। টুলোর পণ্ডিতের বেশভূষা পরে রোজ লাখটাকা কামিয়ে আসেন এই ধরনের চরিত্র এদেশে এখনও অনেক আছেন ; কিন্তু এখন এঁদের অট্টালিকা আশ্রিতহীন, ঘোড়াশালে বিলিতি গাড়ি, জানালায় ঠাণ্ডাইকল, সন্তানের সংখ্যা কম আর তাদের সাজভাবে অঢেল টাকার ঢাক পেটে। এই পরিবর্তন মন্দ কিনা বলা অসুবিধে (একটি পরিবর্তনই আক্ষেপের মনে হয় : আগেকার দিনের ধনী লোকেরা অনেকেই দানবীর ছিলেন ; এই প্রথাটি গেছে)। আজীবন সাধাসিধে থেকে সন্তানদের জন্য অনেক কাঁচা টাকা, সোনা, কোমপানির কাগজ এবং ভাড়াখাটানো বাড়ি রেখে যাওয়া এখনকার ভোগবাদিতার তুলনায় সামাজিক ক্ষতি বোধহয় কিছু বেশি-কম করত না। মোদ্দা কথা, উদ্বৃত্ত টাকা কিভাবে খরচা হবে সে সম্পর্কে ধারণা পালটেছে ; ফলে খাওয়া-পরার, প্রয়োজনীয়তার পরিধি বেড়েছে (এই মোদ্দা কথাটি অনুধাবন করা উচিত : দিল্লীর এক তরুণ ও জাঁদরেল মন্ত্রী দেখলাম সেদিন বলেছেন যে লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা আগের তুলনায় এখন অনেক ভালো, কেননা তিনি দেখেছেন যে অজ গাঁয়েতেও বেশি দামের গায়ে-মাখার সাবান আজকাল অনেক বেশি বিক্রি হয়)।

এই ধারণাগুলি বদলে দেবার ব্যাপারে হিন্দি সিনেমার বোধহয় একটি বড়ো ভূমিকা আছে। ভূমিকা কিন্তু কুরুচির নয় : হিন্দি সিনেমাতে কুরুচি কোথায় ? সকলেই নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে হিন্দি সিনেমার মূল্যবোধগুলির বিরুদ্ধে একটিও আপত্তি তোলা যাবে না (যেমন যাবে না, ধরুন, হ্যারলড রবিনসের নবেলের মোটা বক্তব্যগুলির সম্পর্কে) : অস্পৃশ্যতার, জাতিভেদের, সাম্প্রদায়িকতার, গরিবের উপর অত্যাচারের, টাকার জাঁকের, সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমানে বক্তিমে। বস্তুত ঢালাও জনপ্রিয়তার এক শর্ত এইরকম যে সমাজের মুখস্থ সুভাষিতগুলিকে মোটা অক্ষরে, চিৎকারে প্রচার করে যেতে হবে। আমাদের দেশে যে মানুষ সুযোগ পেলেই হরিজন পোড়ায়, নিদেনপক্ষে পোড়াতে চায়, সে যে-সিনেমা মুগ্ধ দেখে তার গল্পের সারাংশ এইরূপ যে সবার উপরে মানুষ সত্য ; তাহার উপরে যেহেতু নায়কনটী নাচে সেইজন্যই সে দেখে : কিন্তু দেখত না যদি খেমটা নাচে ওইসব লোহার ঘোমটা না থাকত। জটিলতাহীন সৎকথা, অর্থাৎ ভাবালুতাব, সামাজিক গুরুত্ব এইরকম যে তারা সকল সমকালীন কদাচারকে আশ্বস্ত করে। তার মানে অবশ্যই এই বক্তব্য নয় যে এই জনপ্রিয় মাধ্যম সমাজের কোনো ক্ষতি করে। বস্তুত নিজেদের সময়ের সমাজের কোনো পরিকল্পিত উপকার, বা ক্ষতি, বোধহয় এইসব মাধ্যমের সাধ্য আর এক্তিয়ারের বাইরে : বামপন্থী শিল্পের আন্তর্জাতিক ব্যর্থতা যার অনেক প্রমাণ। উপকার বা অপকারের হিসেবের পণ্ডশ্রম না করে প্রভাবগুলি খতিয়ে দেখা দরকার। হিন্দি সিনেমার কান আর মনের আবেদন এই যে তার গল্প আর সংলাপ এদেশের হিতোপদেশ-গুলিকে সুর করে বলে ; ফলে ভাবনাহীন স্বস্তির। তার চোখের আবেদন অথচ আরেক জগতের, যুগের : নতুন ধাঁচের পোশাক, বিলিতি হাওয়াগাড়ি, যন্ত্রে জমকালো বাসস্থান, চিন্তাবিহীন খরচের জগতের চিরপূর্ণিমা। এই মিশ্রণ বোধহয় এক অপূর্ব নতুন জিনিস হিসেবে বছর তিরিশ-পঁয়ত্রিশ আগে থেকে প্রতীয়মান হতে শুরু করেছিল : ফলে ওই সিনেমার এমন অনন্য জনপ্রিয়তা, সারা দেশজোড়া অশ্বমেধের ঘোড়া। হয়তো, ফলে, নকলে, জীবনধারণার পরিবর্তন ; পুরোনো আপ্তবাক্য আর নতুন, বিপরীত আসবাব সমান্তরাল হয়ে উঠতে থাকে। এক তামিল বন্ধুর মতে, কানে-মনে সয় এমন সনাতন গল্প এবং দেখলে লোভে চোখ জলে এইরকম সব হালের মাল একই সঙ্গে অচ্ছেদ্য জুতে হিন্দি সিনেমা শুধু আমাদের খরচের পদ্ধতি পালটায় নি, এক নতুন উচ্চবিত্ত সংস্কৃতিও তৈরি করেছে : কমপিউটারে কোষ্ঠীবিচার যার এক সম্যক উদাহরণ। এমন-কি সিনেমার গল্পের ইডিপাল পরিবার-গুলিকে—(বিধবা) মা ও সবেদন যুবক ছেলে ; (বিপত্নীক) বাবা ও মেয়ে মধুবালা—দেখে তাঁর মনে হয়েছে আমাদের দেশের ঋদ্ধিযুক্ত পরিবারগুলিতে জন্মশাসনের জনপ্রিয়তা কি এইসব গল্পের অজানিত প্রভাবেও ? এসব বিতর্কের কথা বাদ দিলেও বোধহয় মেনে নেওয়া যায় যে ভালো-

থাকা কীরকম সে সম্পর্কে ধারণা পালটে গেছে ; পালটাতে সাহায্য করেছে সিনেমা। নিজের এবং নিজের পরিবারের শারীরিক আরাম আর মানসিক আমোদের জন্য একালের পয়সাবান লোকেরা যেগুলিকে প্রয়োজনীয় মনে করেন তাদের ভোগের দৃশ্য প্রথম ব্যাপক করে সিনেমা, নানা কায়দায় মনোগ্রাহী করে ; সিনেমাই হয়তো ওইসব জিনিস সম্পর্কে প্রয়োজনবোধ তৈরি করে ; পুরোনো হুদি না ঘাঁটিয়েও ওই নবীন তেষ্টা জাগিয়ে চলেছে বলেই হয়তো হিন্দি সিনেমা এত জনপ্রিয় ; এবং জনপ্রিয় বলেই তার দ্বারা প্রচারিত আসবাবগুলি সম্পর্কে বর্ধমান দরকারবোধ।

অবকাশকে রাস্তায় এবং অন্য সময়ের কোণে স্বপ্নে ঘাপটি মেরে থাকে এই ভূমিকা ছাপিয়ে এদেশে সিনেমা যদি, শিক্ষিত সমাজেই, সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধতে শুরু করে থাকে তার এক কারণ হয়তো এই যে আমাদের মুদ্রিত মাধ্যমগুলি বেশিদিনের পুরোনো নয়, দিনযাপনের দ্বারা পোক্ত নয়। ফলে অনুক্রমে যে শক্তি অর্জন করা যায় তা আমাদের এই মাধ্যম জুটিয়ে উঠতে পারে নি। কালাতিপাত মাধ্যমে বনেদিয়ানা আনে ; সময়ের অভাবে এদেশের ছাপা মাধ্যম এই আহিক্সে অর্জন করতে পারে নি। ১৪৫০ সালে ছাপাকল ইয়োরোপে আবিষ্কার হবার সময় সারা পৃথিবীতে বই বলতে ছিল লাখ-খানেক হাতে-লেখা পুঁথি নাকি ; পরের পঞ্চাশ বছরে ছাপা বইয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় এক কোটি ; ওই এক কোটির একটিও ভারতবর্ষে পৌঁছোয় নি পরবর্তী তিনশো বছরে। ম্যাকলুহানের নীহারিকা আমাদের আকাশে উদয় হয়েছে এই সেদিন ; তার তাৎপর্য আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত হবার আগেই শুরু হয়ে গেল অন্য, প্রবলতর মাধ্যমের প্রতিযোগিতা। পশ্চিমের তুলনায়, আমাদের দেশে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি এল বেতার, সিনেমা, টেলিভিশন : গণ্ডিবদ্ধ কথকতার যুগ পুরোপুরি শেষ হবার আগেই এসে গেল বিদ্যুতের দ্বারা আহূত আসর। যে-দেশে অধিকাংশই নিরক্ষর সেখানে ছাপা কাগজ এমনিই নিঃসঙ্গতায় ভোগে ; প্রচার-মাধ্যমের এই বিষম বিকাশ শিক্ষিতদের ছাপা কাগজে থিতু হয়ে বসতে দেয় না। আমি এবং আমার মতোই গিউটেনবার্গে গারদ আরেক প্রৌঢ় বাড়িতে বসে টেলিক্রমিক 'কসমস' দেখতে গিয়ে দুজনেই ফেল হয়েছিলাম ; মনে হয়েছিল ছাপা শব্দের মাল্যদান—ওই লেখকের ওই বইয়েরই শব্দবন্ধ—যেভাবে আমাদের আবাল্য শিক্ষা, কল্পনা, ব্যক্তিগত ব্যথা-উল্লাসকে সমানে ঘুঁটতে থাকে, তার তুলনায় বক্তেশ্বর চিত্রমালা তো অংশ না নিয়ে, উলটো-কচ্ছপের মতো এলিয়ে উপভোগ করার জিনিস, ধুত্তোর। এসব বোধ অবশ্যই ওই পুরোনো নীহারিকার খ্যাকরা : প্রতিটি শব্দের পিছনে পরম্পর আরশি, সব পূর্বপঠিতের অক্ষয় ক্ষুরধ্বনি, বিশালাক্ষী স্মৃতি। যে-কারণে কোনো প্রিয় গল্প-উপন্যাসের সিনেরূপ অনেক সময়েই অতৃপ্তিকর ; যেমন 'চারুলতা' কিছুতেই 'নষ্টনীড়'-এর তেষ্টা মেটায় নি। ছাপা মাধ্যমের আমরা যারা একরকম দাস তাদের আনুগত্যও আসলে ভেতরে-ভেতরে খুব ঠুনকো। আমাদের দেশে ছাপা কাগজ ইশকুল-কলেজ উতরে বাজারে পৌঁছেছে শ-দেড়েক বছর আগে : তার মধ্যে গত পঞ্চাশ বছর সে অন্য মাধ্যমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষায় উদ্ব্যস্ত। আমাদেরই মধ্যে অনেকে ক্লাসিক পড়তে অধৈর্য : যার প্রধান কারণ বোধহয় এই নয় যে ওইসব বই অন্য গন্ধে দূর যুগের সমস্যা পাড়ে। আসলে ওসব গ্রন্থের চরিত্রই আলাদা, কেননা তারা রচিত হয়েছিল সেই নিশ্চিন্ত সময়ে যখন মুদ্রিত মাধ্যমের গদাইলস্করি সাম্রাজ্যে বর্গীপাতের কথা ভাবাও যেত না। যে-দেশে বেশির-ভাগ শিক্ষিত পরিবারের সাক্ষরতার ঐতিহ্য কুল্লে গত চার-পাঁচ পুরুষের এবং বই-কাগজের বড়োবাজার রচিত হয়েছে অন্য মাধ্যমগুলি চালু হবার পরের হইচই আবহে, সেখানে সনাতন বই পড়ার বংশানুক্রমিক সংস্কার তৈরি হতেই পারে নি। যেহেতু আমাদেরও পড়াশোনা প্রধানত অন্যমনস্ক এবং অবকাশরঞ্জক, এবং সেই-সমস্ত বই-পত্রের মধ্যে আবদ্ধ যাদের বিষয়, ভাষা, ঢঙ আনকোরা মাধ্যমগুলির দ্বারা প্রত্যক্ষে-অজ্ঞাতে পরিবর্তিত, পুরোনো নীহারিকার প্রতি আমাদের কোনো কিরে-কাটা আনুগত্য নেই। যার ফলে স্থাণু, মুদ্রিত মাধ্যমে নকল সচলতা চারিয়ে দিতে বাধ্য হন লেখকরা অন্য, ঝলকিত মাধ্যমের নকলে। এ নিয়ে লেখকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। বইয়ের সমালোচনার বদলে লেখক সম্পর্কে গুজব আজ যদি আলোচ্যতর হয়ে ওঠে, তার এক কারণ বইয়ের নিজস্ব সভ্যতা এদেশে বেঁধে উঠতে পারে নি, সময়াভাবে (যার এক উদাহরণ এইরকম যে আমাদের দেশের পত্রপত্রিকায় অক্ষর কমছে, রঙিন ছবি বাড়ছে)। সিনেমার চাপে বিদেশের বইপত্তরের ভাষা কেমন পালটাচ্ছে আমরা আগে আলোচনা করেছি ; সৌভাগ্যত বিদেশের বইয়ের বাজার অনেক পুরোনো, বইতেই বাস্তুঘুঘু এমন মানুষের সংখ্যা সেখানে বিক্রি বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট : ফলে বই তার কণ্টকিত, পাদপাদপ চরিত্র হারায় না পুরোপুরি।

বই এবং অন্য মাধ্যম প্রায় একই সময়ে গণচাউর হবার ফল কী রকম তার এক দেশী উদাহরণ আলোচনা করা যেতে পারে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে রোজ ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের বাঙলা বিকল্প চালু করার চেষ্টা হয়েছিল ছাপা মাধ্যমে : পেয়ালা, পিরিচ, কেদারা ইত্যাদি ; চলে নি। অনুরূপ চলে নি বাঙালি সাহিত্যিকদের চেষ্টা ইংরাজি শব্দবন্ধকে ধুতি পরিয়ে অন্তঃপুরে আনার : বিষণ্ণ ব্যতিক্রম, হস্তান্তরে, এক বিহঙ্গে বসন্ত আসে না ইত্যাদি। পরে অনেক আরো বদখদ বিকল্প বার করে ছাপা কাগজ, যেগুলি একেবারেই চলার কথা ছিল না : কেন্দ্র, গণছুটি, যানজট, গণসংযোগ, মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রত্যেক কষ্টকল্পিত শব্দকে বেতার আজ মুখের ভাষায় পরিণত করেছে পশ্চিমবঙ্গে : ছাপা পাতা যা পারে না, অন্য মাধ্যম তা এইরকম তুড়ি মেরে পারে। কিন্তু ওই পাতা একা কী পারত, সেই পরীক্ষা আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হবার সময় পায় নি। এই সময়াভাবের ফল দুইরকম : যাঁরা মুদ্রিত মাধ্যমের কারবারি—লেখক, প্রকাশক, পাঠক—তাঁদেরও ওই মাধ্যম সম্পর্কে কোনো সাষ্টাঙ্গের আনুগত্য জন্মাতে পারে নি। ফলে, মিনিবাসের হাতলে পতাকার মতো উড্ডীন বাঙালি বালক যেমন পানজাবি উচ্চারণের বাঙলায় চেঁচায়, তেমনি আমার দেশের ছাপা কাগজ আজ সফলতর মাধ্যমের ভঙ্গিকে নাবালক নকল করে। দ্বিতীয়ত, নকলের তুলনায় আসলের প্রভাবই শক্ততর হয় : আমাদের দেশের শিক্ষিত মানুষের সংস্কৃতিতে মুদ্রিত মাধ্যমের ছাপ খুবই নিষ্প্রভ।

মাধ্যম বা মিডিয়া শব্দটি এসেছিল বিজ্ঞাপনের ব্যাবসা থেকে। বছর দশ-বারো আগেও কোনো আত্মসম্মানী সাংবাদিক নিজের বৃত্তি বোঝাতে ওই বহুবচন ব্যবহার করতেন না (নীহারিকার অশীতিপর গ্রাহাম গ্রিন লিখেছিলেন, এখন ব্যাকরণের অতীত একবচনে ওই শব্দের মানে দাঁড়িয়েছে অশুভ সাংবাদিকতা)। ম্যাকলুহান, যাঁর আলোচ্য বিষয়ের পরিধি ছিল নৃতাত্ত্বিক, ওই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তার ব্যাপক আক্ষরিক অর্থে : মুখোমুখি আলাপচারী আর তার বদলে যা-কিছু উপায়ের দ্বারা এক মানুষ নিজেকে একাধিকের প্রতি প্রকাশিত করতে পারে, সব : ছাপা কাগজ (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শেক্সপিয়ারের সনেট থেকে বিজ্ঞাপনের ছবিবুলি), বেতার, সিনেমা, টেলিভিশন, টেলিফোন, ক্যামেরা ও অনুরূপ অসংখ্য যন্তর। প্রতিটি মাধ্যমের একটি লোহালক্কড়ের দিক আছে। (বইয়ের জন্য লাগে ছাপাখানা, সিনেমার জন্য ক্যামেরা, বেতার বা টেলির জন্য আরো নানা কল) ; ওইখান থেকে শুরু করে সাহেব তাদের নিজ-নিজ কেরামতির কথার আলোচনায় এগিয়েছেন। আমাদের বিষয় অনেক ছোটো : জনগণে চল মাধ্যমগুলি এবং তাদের দ্বারা প্রকাশিত মাল—খবরের কাগজ, পত্রিকা, বই, গানের রেকর্ড, বেতার, সিনেমার দুনিয়া, টেলিযন্ত্রের জাদুকর্ম—কিভাবে আমাদের আজ কষায়িত করে। ছাপা মাধ্যমের পাঠ্যপুস্তক বা সরকারি স্তুতিশকে যেমন আমরা, ম্যাকলুহানকে না মেনে, এই আলোচনায় আনব না, তেমনি আনব, যেহেতু তারা মনে-মনে জনতার প্রতি উদ্দিষ্ট, সব সাহিত্যগ্রন্থকে, সব যন্ত্রে ধৃত নিভৃত গানকে, বেতার-টেলির বক্তা আর প্রোগ্রামকারকে, সিনেমার নট আর কর্মীকে, নির্বিচারে, তারতম্য না করে। আঙুল উঠতে পারে : যিনি বেতারে বা টেলিতে নিছক বুকনি-বদন ধার দেন এবং যে-ব্যক্তি বহু যত্নে একটি কবিতা লিখে ছাপিয়ে ফেলেন তাঁদের দুজনকেই একাকারে গণমাধ্যমের ব্যবসায়ী বলা কি ঠিক হচ্ছে ? বলব এই কারণে যে অন্য মাধ্যমের অসারতা নিয়ে আমাদের যতটা সমঝোতা, ঠিক ততটাই বিতর্ক কোনো শিল্পকর্ম একেবারেই ওই পদবাচ্য কিনা তাই নিয়ে। শেক্সপিয়ারকে টলস্টয় অপাঠ্য ভাবতেন এই ধরনের পাগলা উদাহরণ যদি বাদ দিই, বিগত দিনের মানুষদের কীর্তি নিয়েই খালি আমরা একমত। সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো রহস্য বোধহয় এই যে গত হাজার বছরের মহৎ গ্রন্থগুলি সম্পর্কে জ্ঞান সমকালীন সুবিচারের পথ বাতলে দেয় না। ডিকেনস দুর্দান্ত বাজার মাতাতেন তাঁর নিজের সময়েই, কাফকা পাঠক জোটাতে পারেন নি, এইসব তথ্য কোনো নিয়ম তৈরি করে না : হাতে আমাদের এমন কোনো নিরিখ নেই যা খাটিয়ে সময়মতো চিনতে পারি কে ডিকেনস নয় একেবারেই, কে টিটিক্কার সত্ত্বেও কাফকার মতোই। অক্সফোর্ডের কলেজে নিমন্ত্রিত কবি এলিয়টকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কী সেই বিশেষ হীরক যা লেখার মধ্যে আমরা খুঁজব, পেলে বুঝব এতক্ষণে মহৎকে হাতে পেয়েছি। চুপ করে থেকে এলিয়ট বলেছিলেন, আমি ঈশ্বর-বিশ্বাসী, ঠাকুর আমাকে করুণা করে জানিয়ে দেন।

অর্থাৎ জানার কোনো সম্মত চিহ্ন নেই ; মনে-মনে আমরা একটা বাদবিচার করে নিই ঠিকই ; কিন্তু কোন্ নিরিখে সমকালীন লেখকদের আমরা এমন নিভৃতে পাশ-ফেল করাই, তা বিশদ বলা সম্ভব নয় ; বিশেষত এইজন্য যে প্রতিবেশী যাকে ফেল করান তিনি হয়তো আমার পরীক্ষায় ফার্স্টোক্লাশ। গোটা বিচার সুতরাং এইরকম যে যারা গণ-বিনোদে উৎসাহী হয়ে ভিন্ন-ভিন্ন মাধ্যমের সাধক, তারা আপাতত সকলেই এক কেলাসের : আজকের বাঙলায় যদি কোনো রবীন্দ্রনাথ এসেও গিয়ে থাকেন তিনি এবং আকাশবাণীর কথক, টেলিবাকসে মুখভঙ্গিকার, সিনেমার তারা—সবাই এক লাইনে এক অধৈর্যে দণ্ডায়মান। ছাপা অক্ষরে—যেমন হাতে অঙ্কিত ছবিতে, ক্ষোদিত পাথরেও—মহৎ কীর্তির সংখ্যা যেহেতু অনেক বেশি এবং অনেক দিনের, ওই মাধ্যমের একটি গুমোর আছে : যার দৌড় স্বদেশে এই পর্যন্ত যে অন্য সব মাধ্যমের সমালোচনা করার অধিকার ছাপা মাধ্যমকে আত্মপরীক্ষা শেখায় না। লেখক গোর ভিডাল সচিত্র গল্পের সমালোচনায় উষ্মার সঙ্গে লিখেছিলেন : এত ছবি কেন ? এলেম থাকলে যা বলার আছে গন্ধ দিয়ে বলো ! এই উষ্মার উৎস নিজের মাধ্যমের ধর্ম সম্পর্কে গোঁড়ামো : যে স্বধর্মজেদ আমাদের দেশে গড়ে উঠবার সময় পেল না ; নিরক্ষর অর্থনীতিও বাদ সাধল। ছাপা কাগজের বাজার এদেশে অবশ্যই বাড়ছে : লক্ষ করলেই দেখা যাবে তারা যে নিছক অক্ষরে-আটক মাধ্যম নয়, অন্য মাধ্যমগুলির মতোই নিদারুণ চলচ্ছক্তির, এই কুলচ্যুতির চিৎকার তাদের প্রধান আবেদন (কল্প-বিজ্ঞানের গল্পে পড়া যায়, ছাপা বই উঠে গেছে, আক্ষরিক বার্তা সব ভিডিয়োতে উদ্ভাসিত : এমনটা যদি বিদেশ বানিয়ে ফেলতে পারে, সেই প্রযুক্তির অন্যতম খরিদ্দার নিশ্চয়ই হবে আমার দেশের অক্ষরে অনভ্যস্ত শিক্ষিত সমাজ)। অন্য জোরালো মাধ্যমের ডাকে ঢাউস উপন্যাসের সঙ্গে শায়িত পাঠক হঠাৎ উঠে বইয়ের বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে যে যায় নি তার এক কারণ এদেশে বোধহয় এই যে অন্য মাধ্যমের সঙ্গে তাল রেখে ওইসব বইয়ের চরিত্রও চঞ্চলতর হয়ে উঠেছে। এগুলি কোনো অভিযোগ নয় : বইপত্র যাদের প্রতি উদ্দিষ্ট সেই ছোটো শিক্ষিত সমাজেরও প্রধান ব্যসন এদেশে সিনেমা আর বেতার। ওই দুই প্রকাণ্ড ব্যাবসার প্রভাবে প্রতিযোগিতায় ছাপা কাগজের ধরনধারন প্রায় শুরু থেকেই পরিবর্তমান।

এই উদ্‌ভ্রান্ত বাজারে এখন আবার টেলিবাকসো আবির্ভূত। আমাদের দেশে বাকসের বিক্রম সকলের আঁতে এসে বেজেছে ওই পরদা রঙিন হবার পর (কালা থেকে রঙ্গিলা হয়ে উঠল পরদা মাত্র দশ বছরের মধ্যে আমদানির দ্বারা, বিদেশে প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে হয়েছিল, লাগে প্রায় তিরিশ বছর)। ঘরের কোনায় বাস্তবকে হুবহু বিম্বিত হতে দেখা মাত্র সকলেই বুঝতে পারে মাধ্যমগুলির মধ্যে আসল মান্যগন্যির কে। এক সমীক্ষায় প্রকাশ, আমাদের দেশের নগরবাসী শিশুরা বয়স্কদের তুলনায় অনেক বেশি টেলিতে অনুগত। দিল্লীতে নাকি শতকরা পঁচিশ জন প্রাপ্তবয়সী টিভি দেখেন, ছোটোদের শতকরা বাহাত্তর জন ; বোমবাইতে শতকরা উনত্রিশ জন বয়স্ক, শিশু শতকরা চৌষট্টি ; মাদ্রাজে শতকরা সাঁইত্রিশ আর শতকরা বাহান্ন ; আমাগো কোলকাতায় একশোজনে উনত্রিশ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষ, আটষট্টিটি বাচ্চা। সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে, কী দেখানো হচ্ছে বাক্সে সে-সম্পর্কে শিশুদের মুগ্ধতায় কোনো বাদবিচার নেই : মন্ত্রীমশাইয়ের ভ্রমণ, পণ্ডিতী আলোচনা, ধারাবাহিক নাটক, খবর, ধাঁধা, গান, খেলা, বিজ্ঞান, খবর : এই বকবকমের পরম্পরা তারা একই তৃপ্তির সঙ্গে দেখে। তাদেরই জন্য বিশেষ করে তৈরি প্রোগ্রাম সম্পর্কে তাদের কোনো বিশেষ উৎসাহ নেই, আলোচক নবরত্নসভা সম্পর্কে কোনো নিরুৎসাহ নেই, ওই যন্ত্র কোনো সময়েই তারা নেভাতে দিতে রাজি নয় (যে-কারণে টিভি দেখতে-দেওয়া শিশুকে শাসনের পদ্ধতির অঙ্গ এখন)। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের তিন বছর আগের এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছিল, ওই দেশের দুই থেকে পাঁচ বছরের শিশুরা সপ্তাহে আটাশ ঘণ্টা টিভিতে তদ্গত থাকে : অর্থাৎ গড়পড়তা রোজ চার ঘণ্টা। ওদেশে ওই বাকশো চব্বিশ ঘণ্টাই ব্যাদিত ; আমার দেশে, কাজের পাঁচ-ছয়, দিনে, ঘণ্টা আটেক। আশ্চর্য হব না যদি জানি, আমার আত্মীয় শিশু অনেক কম সুযোগ পেয়েও তার মারকিন বন্ধুদের সঙ্গে অভিনিবেশের পাল্লা দিচ্ছে।

সমীক্ষার বিষয় ছিল শিশু ও টেলিভিশন। যে-সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পড়েছি সেখানে কেন বয়স্করা শিশুর তুলনায় কম দেখেন, এই প্রশ্নোত্তর ছিল না। আমাদের শহরগুলিতে, মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ বারঘর থাকে একটি যেখানে সোফাকৌচের সঙ্গে টেলিও পাতা হয়। শিশুর পড়াশুনোর অবকাশের নিজস্ব জায়গা যদি কিছু থাকে সেই জায়গা সাধারণত ওই ঘরে নয়। মা যেহেতু রান্নাঘর কেন্দ্র করে সাঁঝবেলার শেষ ব্যয় করেন, বসবার ঘর দখল থাকে জীবিকার দৌড় থেকে ফেরত পুরুষমানুষের দ্বারা ; তার আত্মীয়-অতিথিদের দ্বারা। এমনটাই বোধহয় যে বসবার ঘরে টেলি জেলে যেই সন্ধে দেওয়া হয়, শিশু সুড়সুড় এসে ঢোকে। বয়স্ক নরনারী আড়চোখে গল্পগাছা করেন, বাছাই প্রোগ্রামের সময় (যখন গৃহিণীও গ্যাস নিভিয়ে দৌড়ে আসেন) শুধু রুদ্ধশ্বাস। শিশু একা একাগ্র সব পান করে। প্রশ্ন করলে বয়স্করা তাঁদের তদ্গততাকে কমিয়ে বলেন, শিশু যে হিসেব জানে না। এর মধ্যে একটি অঙ্কই কিছুতে মেলানো যায় না : একালের পাঠশালার পড়াশুনোও যেহেতু সময়সাধ্য, এইসব আণবিক তপস্বীরা পড়ে কখন ? নাকি, বাচ্চাকে বিদ্বান করা নিয়ে যে জ্বর আমাদের সমবয়সিনীদের মধ্যে দেখেছিলাম তা এতদিনে উপশম, এখনকার বাবা-মায়েরা এই নতুন যন্ত্রের দ্বারা রোগমুক্ত ?

আমেরিকান আর আমাদের শিশু একালের প্রযুক্তিমান আমোদকে একই পরিমাণে রোজ পান করে, এই তথ্য শুধু ম্যাকলুহানের পৃথিবীজোড়া পাড়াগাঁকে স্মরণ করায় না ; প্রমাণ করে যে টেলিবাকসো এমন এক মাধ্যম যার আকর্ষণ অভ্যস্ততার দ্বারা বেড়েই চলবে। আমরা আগে অনুমান করেছিলাম যে, আমাদের দেশের এজমালি পরিবার সিনেমার কল্যাণে শুধু হিন্দিবিরাগ ভোলে না, আধুনিক বেঁচে থাকার আসবাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তৃষিত হয়ে ওঠে। এই ধরনের প্রভাব টেলিবাকসের দ্বারা নিশ্চয়ই জ্যামিতিক হারে বাড়বে। আকর্ষণ তৈরি করার ক্ষেত্র আছে বলেই আকর্ষণ তৈরি আর তাকে মেটানোর মালপত্র বাড়ানোর উদ্যোগ বাড়বে। ফ্যাশন অনেক শাণিত হবে ; ধারে বিক্রির বড়োবাজার তৈরি হবে ; যা না হলে আর চলে না, এমন অপ্রয়োজনীয় জিনিসের তাড়ায় অল্প আয়ের মানুষেরা সমাজ থেকে পালাবার পথ পাবে না। রোজগার যে দেশে বিরল সেখানে এই বিজ্ঞাপনের আলেয়ারা হয়তো বঞ্চিতবোধ বাড়িয়ে চলবে, চুরি-দুর্নীতি বেড়ে যাবে। অধিকাংশই যে দেশে নিরক্ষর, সেখানে হয়তো এই বাকস সাক্ষরতার বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে, যেমন সাক্ষর বিদেশেও সে নিরক্ষরতা ফিরিয়ে আনছে।

এগুলি সবই অনুমান মাত্র : যারা সবই পরে মিথ্যে প্রমাণিত হতে পারে। ছাপার, বেতারের, সিনেমার লোকেদের টেলিবাকস সম্পর্কে যে ঘেন্নাপ্রণয় আছে তার উৎস হয়তো বৃত্তিগত হার এবং ব্যক্তিগত মুগ্ধতা। অন্য মাধ্যমগুলিতে যাঁরা মণিকা, তাঁরা কোনো-না-কোনো ভাবে অসাধারণ : রূপে, মধুস্বরে, অভিনয়ে, ভাষায়, কল্পনায় : ওইসব গুণ তাঁদের নিজস্ব এবং মাধ্যমকে তাঁরা ব্যবহার করতে পেরেছেন ওই গুণগুলি খাটিয়ে। টেলিকল তার কুশীলবদের কাছে কোনো গুণ দাবি করে না : তার পরদা যে কোনো মানুষকে, কোনো সাধনা বা প্রতীক্ষা ছাড়াই, প্রচণ্ড নায়ক বানিয়ে দিতে পারে। সব কীর্তিমান মানুষই সাধারণ্যে পরিচিতি চায়। ওই শিরোপা টেলি তার শিল্পীদের দেয় তৎক্ষণাৎ, কোনো কীর্তির জন্য অপেক্ষা করে না : যিনি খবর পড়েন, তিনিও খবর : প্রতিঘরে সঞ্চারিত বাকসের দাপট এইরকমটা। অন্য মাধ্যমের হেরে-যাওয়া অসূয়ার বশে লেখক নরমান মেলার টেলিশিল্পীদের বলেছিলেন প্লাসটিকের মণ্ড (বিকল্পহীন অর্থনীতিতে যে ধরনের গালাগাল আমরা করতে পারি না : যিনি টেলি-শিল্পী, তাঁর শ্রাবণের মেঘের ভিতরও হয়তো আগুন ছিল, নাচার তাঁকে নিতে হয়েছে ওই জীবিকা) : অর্থাৎ তারা কোনো নিপুণতা বা প্রেরণার দ্বারা বিকট নয় ; অর্থাৎ, ঠিক মানুষ নয়, যন্ত্রের দ্বারা ব্যবহৃত ও শুধু ব্যবহারের দ্বারা বিখ্যাত। প্রধানত ছাপা মাধ্যমের দ্বারা প্রচারিত এইসব আন্তর্জাতিক অপবাদের প্রতিধ্বনি ছাড়াও আমাদের দেশে বাকসের বিরুদ্ধে কিছু নৈতিক আর নান্দনিক আপত্তি শোনা যাচ্ছে। টেলিবাকসের ক্রমিক নাটক, বিজ্ঞাপনের ছররা নাকি এদেশের গরিবদের গোল্লায় দেবে : যে অভিযোগের উত্তর অবশ্যই এই যে এদেশের সিনেমা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, বেতার এইরকম খেলোমির সাধনায় সাধক ছিল এতদিন, টেলি তার নিজস্ব শক্তিতে অধিকতর কৃতকার্য। দ্বিতীয় অভিযোগ এইরকম যে, এই বাকসের দৃশ্য সবই অপকৃষ্ট, অনাকর্ষক। ঠিকই যে যেহেতু সরকারের দ্বারা এই বাকস বগলদাবা, কোনো আমূল বা বিরোধী বিতর্ক এখানে স্থান পায় না, বিদেশে সরকারি টেলিভিশনেও তারা যেমন পায়। প্রতিটি প্রযুক্তিরই অথচ একটি নিজস্ব উৎকর্ষবেগ আছে ; আমাদের দেশের বেকুব বাক্স, আমলার হস্তামলকি হলেও, ক্রমশ দক্ষতর হয়ে উঠবে ঠিকই (যেহেতু সরকারি মাধ্যম, দক্ষতা হয়তো ফুটবে, নান্যপন্থায়, প্রচারকে আমোদ বানাতে, আমোদকে প্রচার)। এই কলের কেরামতি অনেকটাই যন্ত্রনির্ভর,

যেসব যন্ত্র বিদেশী মুদ্রা খরচ করলেই পাওয়া যায়। নিরাপদে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে, সাবানবিক্রি এদেশেও শীঘ্রই শিল্প হবে, কলাবিদরা এই বাকসের দ্বারা স্বেচ্ছাবন্দী হবেন। তা ছাড়া, আমাদের দেশের অন্য মাধ্যমগুলি উৎকর্ষের এমন কষ্টিপাথর নয়, যার নিরিখে এখনকার টেলিই এতটুকুও হেরে আছে। টেলির টক আঙুর সম্পর্কে যেসব গাল পাড়া হচ্ছে তার মূল কারণ বোধহয় এই যে মসীজীবী বন্ধুরা আসলে এই নতুন মাধ্যমের নিজস্ব, এদেশে এখনও প্রচ্ছন্ন, ছেলেদের কৌশলে হতভম্ব।

নীহারিকার নক্ষত্রদের আরেক উদ্বিগ্ন প্রশ্ন : টেলিবাকসে আজ যারা অমন অবাক নিনিমেষ হয়ে আছে, সেইসব শিশুরা বড়ো হয়ে বইটই পড়বে তো, পড়ার বইয়ের বাঁধুনি আলগা হওয়ার পরের জীবনে? মনে হয়, বই, কাগজ, ম্যাগাজিন যেহেতু ক্রমশ অধিকতর বাকসধর্মী হয়ে উঠছে বিক্রির দায়ে, বিক্রি হবে, লোকে পড়বে : টেলিমাধ্যম থেকে মন সরিয়ে ছাপা কাগজে বসাতে তাদের কোনো মানিয়ে নেওয়ার ঝনঝাট পোহাতে হবে না। কিছু বই লেখা হয় পাঠকদের দিকে পৃষ্ঠ ফিরিয়ে, হয়তো অজানা পাঠক (এবং, হায় পাঠিকাও) শত্রু বহির্জগতের পেয়াদা। এসব বই কেউ পড়বে না, যেমন আজও না; লেখা, ছাপা হয়ে চলবে, কেননা আধপোড়া, প্রেরণাময় মানুষদের মধ্যে কেউ-কেউ নাছোড়বান্দা রবেই রবে। যেমন কবিতা ছাপা পাঠক-নিরপেক্ষে চলছে; যেমন গণমাধ্যমের আওতার বাইরে থেকেও চলছে সারা পৃথিবীতে চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য। ছাপা কাগজ, বেতার, সিনেমা, টেলিবাকস এরা—অন্য দেশে যেমন—প্রতিযোগিতা না করে পরিপূরক হয়ে দাঁড়াবে, এখনই অনেকটা যেমন দাঁড়িয়েছে, অবকাশরঞ্জনের বাজারে নানান উপাদান। ছাপা কাগজের স্বধর্ম এদেশে কত অশক্ত, এ নিয়ে আমরা আগে বকেছি: কিন্তু যেহেতু আমরা এ সম্পর্কে সচেতন নই, এই সূক্ষ্ম ক্ষতি অনুভূত হবে না।

বাকি থাকে একটি বড়ো প্রশ্ন : টেলিযন্ত্রের নিজস্ব চরিত্রশক্তি এবং এই নিরক্ষর দেশের উপরে তার অভিঘাত। আমরা যেন কখনো না ভুলি যে এই বৃহৎ দেশে মুদ্রিত মাধ্যম এক অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যাবসা; এবং এই দরিদ্র দেশের সিনেমাশিল্প পৃথিবীর বৃহত্তম; সিনেমার মুগ্ধ দরিদ্রার শুধু গাঁয়ের আনপড় মানুষ নয়, শহরের শিক্ষিতরাও সমান পরিমাণে; এবং শিক্ষিতদের মধ্যেও মুদ্রিত মাধ্যমের মুদ্রাদোষ শক্ত হয়ে বসে নি। এদিকে সাক্ষর বিদেশেই দেখা গেছে যে টেলিবাকস এক বার্তানিরিশেষ মাধ্যম: নীল আলোর দিকে নিনিমেষ স্বদেশ-বিদেশের মানুষ প্রমাণ করে যে এই বাকসই মূল গায়েন, তার গীতি ও গীতকারেরা আনুষঙ্গিক মাত্র। টেলিকলের অসাধারণ বিভিন্নতা এইখানে: সে বাস্তবের বিবরণ দেয় না, এক প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পবাস্তব তৈরি করে। বস্তুত সব বাস্তবই ওই মাধ্যমের দ্বারা পরিবর্তিত: দূর ঘটনাকে ঘরের মধ্যে মুখোমুখি হাজির করে সে প্রতি দিনের সঙ্গে সমান্তরাল এক প্রতিবাস্তব তৈরি করে। দিবসরাত্রিকে কাল্পনিক ভাগ করার যন্ত্র ঘড়ি ছাড়া যেমন আমাদের আজ দিন কাটে না, তেমনি যা ঘটছে তাকে ঘরের মধ্যে রোজ রঙিন অনুদিত করার এই যন্ত্র ক্রমশ নিঃশ্বাসের সঙ্গী হয়ে ওঠে। অক্ষরে অনভ্যস্ত, সিনেমায় নিষিক্ত আমাদের সমাজ আজ ঘরের মধ্যের যে লাগাতার সিনেমার দ্বারা রান্না হচ্ছে তার মূল আকর্ষণ নাটক বা গান বা গেলার চলছবি নয়: ঘটনাপ্রবাহ ঘটে যেতে দেখার আনন্দ। এই পরদার রাজপুকুরে চাঁদবদন, মন্ত্রীর অমায়িক হাসি, লাজুক গালের টোল এমন এক-এক ঘটনা যা তাঁদের উক্তি আর কীর্তির চেয়ে অনেক বেশি অভিঘাতের, গুরুত্বপূর্ণ; এবং নেশা মেটানোতে কোনো ক্রমিক যাত্রা যার ধারেকাছে পৌঁছুতে পারে না। প্রধানত নিরক্ষর অথচ পুরাকাহিনীর শ্রুতিতে অভ্যস্ত এই দেশে বাকসের বিশ্ব ক্রমশ ঘটনার বিকল্প হয়ে দাঁড়াতে পারে; এবং নকল ঘটনার বিশ্বাসী চাক্ষুষ সাক্ষী বেড়েই চলবে। আমাদের দেশের আদিগন্ত গ্রাম এবং চৌকশ একচিলতে নগর এইভাবে হাজার বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে নিকটে আসবে, মাধ্যমের ভিত্তিহীন ঘটনার সাহায্যে। সাতচল্লিশের মাঝরাতে জাত আমাদের স্বাধীন রাজনীতি এখন অনেকটাই গুজবের উপর দিয়ে চলে: সব জনরব সরিয়ে টেলিবাকস তার বাস্তব সিনেমা আনছে রাজনীতিতে। এমনটা ঘটছে, ঘটবে কোনো শ্রেণীগত ষড়যন্ত্র বা দিল্লীর দূরদর্শী ফন্দির ফলে নয়। আমাদের বর্তমান প্রযুক্তির, পছন্দের বেগ ওইদিকে আমাদের সমানে টানছে: যেজন্য, বোধহয়, এই প্রগতির হাত থেকে এবার কোনো উদ্ধার নেই; যে প্রগতি আমাদের এতাবৎ-জাত রাজনীতিকে সম্পূর্ণ পালটাচ্ছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপন

শঙ্কর ভট্টাচার্য

বাঙলা সাহিত্যে বিহারের দান অনস্বীকার্য। শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে বনফুল, কেদারনাথ, সতীনাথ, শরদিন্দু এবং বিভূতিভূষণ প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম একনিঃশ্বাসে বলা যেতে পারে যাঁরা বিহারে বাস করে বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সেই অবিস্মরণীয়দেরই একজন, এবং বর্তমানের স্থিতিশীল লেখকদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। তিরানব্বই বছর বয়সেও তাঁর লেখনী অত্যন্ত সজীব এবং সংগঠনের ব্যাপারে তিনি আজও অত্যন্ত সক্রিয়। বিহারের বাঙালির সামাজিক জীবনে তিনি হলেন সব্যসাচী।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরসস্রষ্টা বলে পরিচিত। সাহিত্যসাধনায় মিতাচারী বিভূতিভূষণ ব্যক্তিগত জীবনেও অত্যন্ত মিতভাষী। বর্তমান সাক্ষাৎকারে তিনি এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন যে, তিনি সিরিয়াস লেখার প্রতি বেশি মনোনিবেশ করেছেন অথচ হাস্যরসস্রষ্টা বলে তিনি পরিচিত হয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের সিরিয়াস দিকটি অনালোচিত রয়ে গেছে। বিভূতিভূষণ আরও জানিয়েছেন যে এ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য নিয়ে তিনটি গবেষণা হয়েছে। (গবেষক ড. সরোজ দত্ত, ড. বিপিন মিশ্র, ড. অনিল গঙ্গোপাধ্যায়।)

প্রশ্ন : আপনার লেখার প্রশস্ত সময় কখন?

বিভূতিভূষণ : দিনের বেলায় আহারের পর। কখনও বিশ্রাম পাই, কখনও মা সরস্বতী সেটুকু দিতেও কার্পণ্য করেন।

প্রশ্ন : কী ধরনের কাগজ আপনি ব্যবহার করেন?

বিভূতিভূষণ : আমি সাধারণত একসারসাইজ খাতায়, রুল-না-টানা সাদা পাতায় লিখে থাকি।

প্রশ্ন : আপনি কি লেখার আগে প্লট ভেবে রাখেন?

বিভূতিভূষণ : একটা প্লট নিয়ে আরম্ভ করতেই হয়। ব্যাপারটা বোধহয় এইভাবে বলা যায়—শূন্য আকাশ নয়। একগুঙ মেঘ সামনে রেখে বসা, তারপর তার আকারও কিছু-কিছু বদলায় এবং রঙের বৈচিত্র্য। অবশ্য কম-বেশি করে।

প্রশ্ন : উপন্যাসের জনপ্রিয়তা কি শেষ হয়ে যাচ্ছে?

বিভূতিভূষণ : হ্যাঁ। এর লক্ষণটা যেন দিন-দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমার মনে হয়। এটা বোধহয় ওই নিয়মেই হচ্ছে যে কোনো জিনিসই একটা স্থায়ী নিয়ম নিয়ে থাকতে পারে না। গোড়ায় ছিল কাব্য। সব ভাষাতেই। প্রতি কথাতেই ছন্দ। সংস্কৃততেও "কাদম্বরী" আর হয়তো কয়েকখানা বই আসর রক্ষা করেছিল।

পশ্চিমীসাহিত্য আমাদের এই নূতন ধারার সঙ্গে পরিচিত করল। বঙ্কিম থেকে চলল। এখন মনে হয় এ ধারাও একটু শুকিয়ে এসেছে। সম্প্রতি আমার এই ধারণার সমর্থন পেলাম একটি মাসিক পত্রিকায়। লেখক লিখছেন বইমেলা ঘুরে তাঁর অভিজ্ঞতা, উপন্যাসের জায়গায় প্রবন্ধসাহিত্য নানা বিষয়ে যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কথাটা বিচার করে দেখবার মতো।

সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন : স্বাধীনতার পরবর্তী কালের বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব ধারণা কী?

বিভূতিভূষণ : মনে হয় পঞ্চমের দশকে (১৯৫০—) সাহিত্য আমাদের এমন একটা পথ নিয়েছিল যে নৈরাশ্যজনক হয়ে পড়েছিল। এই সময় আর-একটা ভীষণ ব্যাপার হয়েছে, যা নিয়ে সকলের সঙ্গে আমার মত মিলবে না। সাহিত্য এমন একটা রাস্তা নিয়েছে যে বই আনিয়ে ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া একটা আতঙ্ক হয়ে পড়েছিল। পঞ্চাশ থেকে ষাট-পঁয়ষট্টি পর্যন্ত এই পনেরো-ষোলো বছর বড়ো অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। এত আবিলতা ঢুকে গিয়েছিল যা সামলাতে পারা যাচ্ছিল না। শুধু আবিলতাই নয়। আর-একটা কথা। এই আবিলতা যাঁরা সৃষ্টি করছিলেন, তাঁরা বলছিলেন, এগুলো না লিখলে সমাজসচেতন হতে পারবে না। অনেক শক্তিমান লেখক সেই সময় হয়েছিলেন কল্লোল-যুগে। কিন্তু এই সর্বনেশে সাহিত্য এত ব্যবসায়িক, এত 'কমারশিয়ালাইজড্' হয়ে পড়ল যে তখন যেন মনে হয় তাঁরা সমাজের কথা চিন্তা করছেন না। পকেট ভরবার জন্যে সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। এ কথা আমাকে বলতেই হয়।

একটা ভালো দৃষ্টান্ত যে তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে, এখন আবার সুস্থভাবে কলম ধরে সাহিত্যসৃষ্টি করতে অগ্রণী হয়েছেন। সাহিত্য যেন আবার খোলস ছাড়াচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ চলে যাবার পরে আমাদের কেউ ছিল না—একথা আমি স্বীকার করি না। অনেক শক্তিশালী লেখক ও সাহিত্যিক রয়েছেন।

প্রশ্ন : আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কার লেখা আপনার পছন্দ?

বিভূতিভূষণ : এর উত্তর আমি ক্রমপর্যায় বেঁধে বলতে পারি না। কেননা, আমার বয়সের জন্য সংযোগ একটু কমে আসছে। যেটুকু আছে তাতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শংকর, বুদ্ধদেব গুহ, জরাসন্ধ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রভৃতি কয়েকজনের লেখা বেশ রসপুষ্ট বলে মনে হয়। উপন্যাসে। আশাপূর্ণা, বিমল মিত্র—এঁদের স্তরের লেখক-লেখিকাদের কথা এখানে বাদ দিলাম।

প্রশ্ন : লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী?

বিভূতিভূষণ : আজকাল এইজাতীয় পত্রিকার প্রসার খুব বেড়েছে এবং প্রায় সবগুলোতেই কিছু না কিছু জিনিস থাকেই যা 'great' ম্যাগাজিনে অনায়াসেই স্থান পাবার যোগ্য।

প্রশ্ন : কোন্ লেখা লিখে আপনি সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পেয়েছেন?

বিভূতিভূষণ : অবশ্যই "স্বর্গাদপি গরীয়সী"। এটি বোধহয় আমার দ্বিতীয় উপন্যাস। যতদূর স্মরণ হচ্ছে এর মতন কোনো উপন্যাসে আমার মনকে টেনে নিয়ে যেতে পারে নি। মাঝে-মাঝে অবশ্য পত্রপত্রিকায় জোগান দিতে বা নিজের শখে কিছু-কিছু গল্প লিখে গেছি। সেগুলোকে আমার চিন্তার কমা, সেমিকোলন বলতে পারি। "স্বর্গাদপি গরীয়সী" ১৩৫২—১৩৫৪ শেষ হয়ে গেছে। এক নিঃশ্বাসে বললে বোধহয় ভুল হবে না।

প্রশ্ন : আপনি তো প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন, কোনো প্রবন্ধসংকলন বা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কি?

বিভূতিভূষণ : আমি এত বেশি প্রবন্ধ লিখি নি যাতে একটা ভদ্র রকমের সংকলন-গ্রন্থ হতে পারে। আমার প্রবন্ধ যা আছে তা বিক্ষিপ্ত। কিছু সাময়িক ঘটনা নিয়ে। কিছু জীবনী নিয়ে। কিছু হয়তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে। অর্থাৎ খাপছাড়া। যখন যা মনে এসেছে। ভাষণগুলো আজকাল টেপ হয়ে গিয়ে প্রবন্ধের আকার নিচ্ছে। তাহলে সেগুলোকে এভাবে জাতে তুলে নিলে সংখ্যা অবশ্য কিছু বাড়ে। কারুর সংবর্ধনা, নিজের সংবর্ধনার উত্তর ইত্যাকার।

প্রশ্ন : আপনি একমাত্র বাঙালি লেখক যাঁর জীবদ্দশায় তিনটি গবেষণা হয়েছে এবং আরও হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনি কিছু বলবেন?

বিভূতিভূষণ : এ বিষয়ে তাঁদের কিসে প্রেরণা জুগিয়েছে আমার পক্ষে বলা শক্ত। তবে জীবিত লেখকের বিষয়ে গবেষণা করার অধিকার পাওয়া পর্যন্ত একটা যে স্রোতের মুখ খুলে গেছে তাতে অনেকের সঙ্গে আমাকেও এই ভাসিয়ে দেবার অভিসন্ধি আমার মনে কৌতুকই সৃষ্টি করে, এইটুকুই বলতে পারি।

প্রশ্ন : আপনার নিজের সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

বিভূতিভূষণ : আমার সাহিত্যের সমালোচকেরা দুটো দিক ধরেন। একটা কৌতুকরসের, হাস্যরসের ; একটা গভীর রসের। সিরিয়াস রসের সাহিত্য সৃজনে কৌতুকরসটা আমার মধ্যে যে কী করে এসে পড়েছে তা আমি নিজেই বুঝতে পারি না। কৌতুকরস দিয়ে আমি আমার সাহিত্য আরম্ভ করিনি। আমি দুঃখ দিয়েই আমার সাহিত্য আরম্ভ করেছি। তবে, আমি এটা বিশ্বাস করি, মানুষকে ভগবান অনুভূতির মধ্যে যে সম্পদ দিয়েছেন, তার মধ্যে হাসিই সবথেকে বড়ো সম্পদ। সেই হিসেবে হাসির একটা মস্ত বড়ো জায়গা রয়েছে মানবজীবনে। মানবজীবন বলছি এই জন্যে যে, এই সুন্দর, কোমল মধুর জিনিসটা ভগবান আমাদের মধ্যে যেরকমভাবে বণ্টন করেছেন, সৃষ্টির অন্য জীবের মধ্যে তা বণ্টন করেছেন কিনা জানি না। জানি না যে, ঘোড়া হাসে কি না ; বাঘ হাসে কি না জানি না। যদি কখনও আমরা ঘোড়া বা বাঘ হয়ে জন্মাই, সেদিন বুঝব হাসছি কি না।

আনন্দের যে বহিঃপ্রকাশ সেটা আমি অন্যান্য জীবের মধ্যে খুব কম দেখেছি, অন্তত চক্ষুকে .আয়ত করে যে হাসি, সেটা আমি অন্য জীবের মধ্যে দেখি নি। ভগবান যে আমাকে এই শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি দিয়েছেন এবং আমি যে কিছুমাত্র আনন্দ পাঠকদের পরিবেশন করতে পেরেছি, এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ.। কিন্তু একটা কথা বলি। আমার বাইরে হাসি আছে। আমার ভেতরে হাসি নেই। আমার হাসি আমার অশ্রুকে চাপা দিয়ে রেখেছে। আমার ভেতরটা অশ্রুতে ভরা।

আমার গল্পে হাসি এসে পড়ে, কিন্তু বোধহয় দু-তিনটে

নভেল ছাড়া আমি সম্পূর্ণভাবে হাসির নভেল লিখতে পারি নি। আমার যা কিছু নভেল, সব দুঃখের। সব সমস্যার। সব অন্য-অন্য রসের। হাসির জন্য পাঠকেরা আমাকে ক্রেডিট দেন, যশ দেন কিন্তু হাসিটা আমার জীবনের মূল জিনিস নয়। হাসিটা আমার অপকার করেছে। আমার যা বলবার ছিল, আমার যা অশ্রু, আমার হাসি চাপা দিয়েছে।

প্রশ্ন : বাঙলা সাহিত্যের কোন্ নারীচরিত্রটি আপনাকে প্রভাবিত বা মুগ্ধ করেছে?

বিভূতিভূষণ : উত্তরটা আমার পক্ষে দেওয়া শক্ত। লেখার পরিধি যাই হোক, বই পড়ার পরিধি একটু সংকীর্ণ। এতে হয়তো আমাদের উপন্যাসের অনেক ভালো চরিত্র সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ। নারীচরিত্রের মোটামুটি দুটি প্রধান রূপ—একটি শান্ত, সংসারের নানান রকম ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে নিজের অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে ; আরেকটি দৃপ্ত, বিদ্রোহের ভাব নিয়ে যেটা বর্তমান যুগে বেশ বেড়ে চলেছে। নিশ্চয়ই দুটির প্রয়োজন আছে। মনটা বরং প্রথম দিকেই একটু ঝুঁকে পড়ে। একটা ছোটো সাক্ষাৎকারে খুব বেশি খোঁজার সময় নেই। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইল"-এর নায়িকা ভ্রমরের দিকে মন চলে যাচ্ছে। তাঁর মধ্যে বিদ্রোহের সুর নেই, হয়তো খানিকটা থাকলে ভালো হত। তবে একটা জিনিস মুগ্ধ করে। তাঁর নিজের constancy-র ওপর অটুট বিশ্বাস। যেটাকে আমরা সতীধর্ম বলে এসেছি এবং যা উপন্যাসে ওইভাবে পরিণতি এনে দিল। তোমাদের এই সাক্ষাৎকারের আকস্মিকতা বেশি ভাবার সময় দেয় না। তোমার প্রশ্নে আমার ভ্রমরের কথাই হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একটু বললাম। এর মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যাবার সম্ভাবনা।

প্রশ্ন : শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী?

বিভূতিভূষণ : এ বিষয়ে এটুকু বলতে পারি একথা ঠিক যে নারীকে পুরুষের মতোই মনুষ্যত্বের সমান স্তরে দাঁড় করিয়ে সম-মর্যাদায় শরৎচন্দ্র যেভাবে নারীচরিত্রগুলি এঁকেছেন, তাতে তিনি এক হিসেবে অনন্য। তাঁর সমস্ত সাহিত্য পড়লে মনে হয় তাঁর জীবনের এই ছিল মিশন। নারীকে অবশ্য আরও অনেকে তাঁর স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। তবে শরৎসাহিত্যে এই জিনিসটা অত্যন্ত প্রকট।

প্রশ্ন : আপনার সৃষ্ট কোন্ নারীচরিত্রটি সার্থক বলে মনে করেন?

বিভূতিভূষণ : এ প্রশ্নটিও তোমার প্রথম প্রশ্নের মতো শক্ত। অনেক চরিত্রের মধ্যে খুঁজে দেখে বললেও খানিকটা থেকে যায়। "তোমরাই ভরসা" উপন্যাসে ডোরা নামের একটি ক্রীশ্চান মেয়ের কথা বলি। সার্থকতার প্রশ্নে আমি বলছি ডোরা সার্থক এই হিসেবে নিজের প্রিনসিপিল বা জীবনবেগ থেকে কখনও নড়ে নি। বরাবর অটল থেকে গেছে।

প্রশ্ন : আজকাল নারীপ্রগতি বা নারীস্বাধীনতা প্রভৃতি শব্দ খুব বেশি শোনা যাচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

বিভূতিভূষণ : নারীদের আমরা বিশেষ করে হিন্দুসমাজে যেভাবে চেপে রেখেছি তাতে তাঁদের সুস্থ অথচ অবারিত প্রগতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না। সেদিক দিয়ে নারীর আত্মপ্রচেষ্টার প্রয়াসের জন্য আমাদের এই যুগটি বিশিষ্ট। কিন্তু বহুদিন বদ্ধ হাওয়ার মধ্যে পড়ে থাকায় প্রগতির গতিবেগটা সবক্ষেত্রে বেশ সুসংযত নয়, এবং তার জন্যে পরিণাম সবক্ষেত্রে শুভ হচ্ছে না। বিশেষ করে আমাদের ভারতবর্ষে। যাতে আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রগতির গতি নিয়ন্ত্রিত হয় সেদিকে চিন্তাশীল নারী-পুরুষ উভয়েরই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

প্রশ্ন : বহু পাঠক মনে করেন "নীলাঙ্গুরীয়"-র মীরা চরিত্রটি আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এ বিষয়ে আপনি কী মনে করেন?

বিভূতিভূষণ : মীরা আমার নারীচরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এ কথা বলা যায় না। এটুকু বলতে পার, তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি, মননশীলতা, তাঁর পরিবেশ প্রভৃতি নিয়ে তাঁর জীবনে যে সম্ভাবনাটুকু ছিল, ঘটনাচক্রে তা সার্থক না হওয়ায় পাঠকের সহানুভূতি তাঁর দিকে সবচেয়ে বেশি যায়।

প্রশ্ন : নারী-চরিত্র সৃষ্টির জন্যে তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া প্রয়োজন, না বই পড়ে বা শুনে অভিজ্ঞতা অর্জন করাই যথেষ্ট?

বিভূতিভূষণ : লেখক হতে হলে এই দুটি ধারাই অবলম্বন করতে হয়।

প্রশ্ন : অকৃতদার থাকায় জীবনে কখনও একাকিত্ববোধ এসেছে কি?

বিভূতিভূষণ : তোমার এ প্রশ্নে আমার একটু হাসি পায়। জীবনের একটা সময়ে হয়তো একটু প্রশ্ন উঠেছিল মনে। কিন্তু সেটা উগ্র আকার ধারণ করলে একাকিত্ব বিনষ্ট করবার যথেষ্ট উপায় ছিল।

আমি খুব বৃহৎ পরিবারে মানুষ। সুতরাং এক দাম্পত্য

সুখ-দুঃখ বা সুবিধা-অসুবিধা ছাড়া সবই তো পেয়ে গেছি শ্রীভগবানের অফুরন্ত কৃপায়। সুতরাং একাকিত্বের প্রশ্ন আর আসে কোথা থেকে!

জীবনপঞ্জী

জন্ম—২৫শে অক্টোবর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।
গ্রাম—পাণ্ডুল (দ্বারভাঙ্গা জেলা)।
পিতামাতা—বিপিনবিহারী, গিরিবালা।
আদি নিবাস—শ্রীরামপুর, চাতরা।
বর্তমান বাসস্থান—কাঁঠালবাড়ি, দ্বারভাঙ্গা (বিহার)।
পড়াশোনা—চাতরায় মহাদেব মাসটারের পাঠশালায় সূত্রপাত।

পরে বাংলাস্কুলে (দ্বারভাঙ্গা রাজ-স্কুলের একটি অংশ) চার বছর এবং রাজ-স্কুল থেকে ১৯১২ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাশ। ১৯১৩ সালে বিপন কলেজ (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) কলকাতা থেকে ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯১৬ সালে পাটনা বিএন কলেজ থেকে বিএ পাশ। কর্মজীবন—১৯১৭ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত। অধিকাংশ সময় শিক্ষকতা। কর্মক্ষেত্রের তালিকায়—মাড়োয়ারী স্কুল (দ্বারভাঙ্গা), মুখার্জী সেমিনারি (মজফরপুর), রাজ-স্কুল (দ্বারভাঙ্গা) প্রথম পর্যায়, মহারাজা কামেশ্বরসিং-এর একান্ত সচিব, রাঘোপুরের বাবু রঘুনন্দন সিং-এর ছেলের গৃহশিক্ষকতা, বি. বি. কলেজিয়েট স্কুল (মজফরপুর), পাণ্ডুল স্কুল, দ্বারভাঙ্গা মহারাজের ভাগে কান্হাইয়াজীর গৃহশিক্ষক, রাজ প্রেসের ম্যানেজার, রাজ-স্কুল (দ্বারভাঙ্গা) দ্বিতীয় পর্যায় ও পাটনার 'ইণ্ডিয়ান নেশন'-এর ম্যানেজার।

সাংসারিক জীবন: অবিবাহিত, বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের মেজোকর্তা। অবসর বিনোদন: খেলাধুলা,(নামকরা ফুটবলার), গান গাওয়া, নিজহাতে ফুলবাগান করা আর বেড়ানো। সাহিত্যজীবন—প্রথম ছোটগল্প 'অবিচার' ১৯১৫-১৬ সালে "প্রবাসী"-তে প্রকাশিত। পরে "প্রবাসী", "শনিবারের চিঠি", "বঙ্গশ্রী", "মানসী ও মর্মবাণী", "কল্লোল" "বিচিত্রা" প্রভৃতি পত্রিকাতে বহু গল্প প্রকাশিত হয়॥ চলচ্চিত্র: নীলাম্বুরীয়, বরযাত্রী, টনসিল, দোলগোবিন্দের কড়চা, পরিশোধ, কাঞ্চনমূল্য, দৈনন্দিন (দম্পতি নামে), রাণুর প্রথম ভাগ, ফুলেশ্বরী, শ্রীমান পৃথ্বীরাজ, স্বর্গাদপি গরীয়সী। পুরস্কার ও সাম্মানিক—প্রবাসী গল্পপ্রতিযোগিতায় তিনটি পুরস্কার॥ আনন্দবাজার পুরস্কার, শরৎসাহিত্য পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন প্রদত্ত 'যুগান্তর' পুরস্কার, কবিশেখর কালিদাস রায় পুরস্কার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রদত্ত স্বর্ণপদক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমির পক্ষে সংবর্ধনা, বিশ্বভারতী-প্রদত্ত দেশিকোত্তম উপাধি॥

বিহার সরকারের একটি মাসিক সাম্মানিক পান। বিহার বাংলা আকাডেমির প্রথম অধ্যক্ষ। নবতিতম জন্মবর্ষে পাটনায় বিহারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (৬২টি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যেমন—নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও বিহার বাঙালী সমিতির বিভিন্ন শাখা, পাটনা ও মগধ বিশ্ববিদ্যালয়, উর্দু আকাডেমি, মৈথিলী আকাডেমি, বাংলা আকাডেমি, খোদাবক্স লাইব্রেরী, রবীন্দ্র পরিষদ, বিদ্যাপতি পরিষদ) এর পক্ষে বিপুল সংবর্ধনা। বিভূতিভূষণ সম্পর্কে এ পর্যন্ত বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে 'কথাসাহিত্য' (কলকাতা), 'শাশ্বত বাণী' (মজফরপুর) 'সৌরভ' (সমস্তিপুর)।

উল্লেখযোগ্য রচনা

গল্পসংকলন—রাণুর প্রথম ভাগ (১৩৪৪), রাণুর দ্বিতীয় ভাগ (১৩৪৫), রাণুর তৃতীয় ভাগ (১৩৪৭), বর্ষায় (১৩৪৭), বসন্তে (১৩৪৮), শারদীয়া (১৩৪৮), রাণুর কথামালা (১৩৪৮), বরযাত্রী (১৩৪৯), বৈতালী (১৩৫০), অতঃকিম্ (১৩৫০), কায়কল্প (১৩৫১), দৈনন্দিন (১৩৫২), আগামী প্রভাত (১৩৫২), ফণ-অন্তঃপুরিকা (১৩৫৩), অষ্টক (১৩৫৪), বাস্তব ও অবাস্তব (১৩৬১), রাণুর চিঠি (১৩৬১), কোকিল ডেকেছিল (১৩৬২), বেলরঙ্গ (১৩৬৫) প্রমুখ।

উপন্যাস—নীলাম্বুরীয় (১৩৪৯), স্বর্গাদপি গরীয়সী তিনখণ্ড (১৩৫১-'৫৪), তোমরাই ভরসা (১৩৫১), নবসন্ন্যাস (১৩৫৯), উত্তরায়ণ (১৩৫৯), কদম (১৩৬৩), মিলনান্তক (১৩৬৬), রূপ হলো অভিশাপ (১৩৬৭), পরিশোধ (১৩৬২), ফুলেশ্বরী (১৩৬৯), অযাত্রার জয়যাত্রা (১৩৬৯), দোল গোবিন্দের কড়চা (১৩৭১), এবার প্রিয়ম্বদা (১৩৭৪), তাঞ্জাম (১৩৭৭), দুই কন্যা (১৩৮৪), পুঁটুরাণী (১৩৮৮), একটি যুগের জন্মকথা (১৩৮৮), সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে (১৩৯৩) প্রমুখ।

অন্যান্য রচনা—দুয়ার হতে অদূরে (১৩৫২, ভ্রমণকাহিনী), সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার (১৩৭৪, সমালোচনা-গ্রন্থ), কুশীপ্রাঙ্গণের চিঠি (১৩৮০, ভ্রমণকাহিনী), জীবনতীর্থ (১৩৮৬, আত্মজীবনী)।

প্রসঙ্গ হেমাঙ্গ বিশ্বাস

অভিজিৎ করগুপ্ত

শ্রীহট্টের লুলা নদী। বৈঠা হাতে মাঝিরা গান গায়: 'সাবধানে গুরুজীর নাম লইও রে সাধু ভাই / সাবধানে গুরুজীর নাম লইও।' এ এক সারিগান। ১৯৪২ সাল। অবিভক্ত আসামের সুরমা উপত্যকার উত্তাল কৃষক-আন্দোলনের বুক চিরে বেরিয়ে এল এই বহুপরিচিত আঞ্চলিক সারিগানের সুর দিয়ে তৈরি এক অসাধারণ গণসংগীত। এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মেহনতি কৃষক গর্জে উঠলেন: 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান / কিষাণ ভাই রে, / কাস্তেটারে দিও জোরে শান।' আসাম আর বাঙলার হাজার-হাজার গ্রামের পরিধি ছাড়িয়ে এই গান ধীরে-ধীরে সঞ্চারিত হয়ে গেল নগরজীবনেও। প্রায় বাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন এক সন্তোগৃহত্যাগী জমিদার-তনয়—নাম হেমাঙ্গ বিশ্বাস। তারপরও কেটে গেছে পয়তাল্লিশটি বছর। কৈশোর, যৌবন, রোগাক্রান্ত মধ্যবয়স, এমনকি বার্ধক্য—সব সময়ই হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখনী এবং কণ্ঠ এক নির্ভীক প্রেরণার আবেদন নিয়ে এগিয়ে এসেছে; বারবার তাঁর সংগীত থেকে উৎসারিত হয়েছে ঐতিহ্য, আধুনিকতা এবং প্রতিবাদী মূল্যবোধের স্বর্ণাভ দীপ্তি। বস্তুত আজ, এই মুহূর্তে, ভারতে গণসংগীতচর্চার ইতিহাসবীক্ষণে বসে হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। প্রগতিশীল গণ-আন্দোলনকে উজ্জীবিত করার জন্য সংগীতকে ব্যবহার এবং গণমুখী করবার প্রয়াসের নথি ঘাঁটতে বসে অনিবার্যভাবেই এসে যায় এই শীর্ণকায় অথচ তেজোদৃপ্ত মানুষটির নাম। শুধুমাত্র গীতিরচনা এবং সুরসৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে হেমাঙ্গবাবুর প্রতি অন্যায় করা হবে, ওঁর প্রতিভা এবং কর্মজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে সামাজিক দায়বদ্ধতার চেতনা এবং বিপ্লবমনস্কতা। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই হেমাঙ্গ বিশ্বাসের স্বচ্ছন্দতম বিচরণভূমি, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে এই মানুষটি ভারতের রকমারি গণ-আন্দোলনকে নিরীক্ষণ করেছেন একেবারে সামনে থেকে। ওঁর মনন এবং চিন্তার প্রতিটি প্রকোষ্ঠই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

১৩১৯ সনের ২৭শে অগ্রহায়ণ আসামের সুরমা উপত্যকার হবিগঞ্জ মহকুমার মিরাশী গ্রামে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্ম। সেটা ছিল ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রামের মিডল ইংলিশ স্কুলে পড়ার সময় থেকেই হেমাঙ্গ বিশ্বাস সংগীতের ভক্ত। স্কুল-জীবনের পর পড়তে আসেন সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজে। এই সময়েই জড়িয়ে পড়েন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে। ফলস্বরূপ বিতাড়িত হন কলেজ থেকে, এবং গ্রেপ্তার হন ১৯৩০ সালে। প্রায় আড়াই বছর নওগাঁ এবং গৌহাটি জেলে কাটানোর সময় পরিচিত হন বিমলাপ্রসাদ চালিহা এবং জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালের সঙ্গে। এঁরা দুজনেই আসামের সাংস্কৃতিক জগতের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বিমলাপ্রসাদ পরবর্তী কালে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। জেলে থাকতেই আক্রান্ত হন যক্ষ্মারোগে। এরপর কিছু দিন যাদবপুর টি. বি. হাসপাতালে কাটানোর পর ফিরে যান মিরাশী গ্রামে। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার সময় থেকেই হেমাঙ্গ বিশ্বাস কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি উৎসাহী হয়ে ওঠেন। যাদবপুর থেকে মিরাশীর গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়ে জড়িয়ে পড়লেন স্থানীয় কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে। ছেলের এই জমিদার-

সংগীত

জোতদার-বিরোধী রাজনীতিকে ভালো চোখে দেখেন নি বাবা হরকুমার বিশ্বাস। পিতাপুত্রের দ্বন্দ্ব একসময় চরমে ওঠে। প্রায় বিতাড়িত হয়েই হেমাঙ্গবাবু বেরিয়ে এসেছিলেন ঘর ছেড়ে। ১৯৪২-এর সেই দিনটির পর আর ফেরেন নি ঘরে। এরপর সুরমা ভ্যালি কালচারাল ট্রুপ থেকে শুরু করে আসাম আই-পি-টি-এ—সর্বত্রই হেমাঙ্গ বিশ্বাস একজন উৎসাহী উদ্যোগী। অতিরিক্ত পরিশ্রমে আবারও অসুস্থ হয়ে পড়ায় ১৯৫৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রীবিশ্বাসকে চীনে পাঠায় চিকিৎসার জন্য। প্রায় আড়াই বছর ছিলেন ওখানে। পরে আরো দুবার হেমাঙ্গবাবু চীনে গেছেন। শেষবার চীন সরকারের আমন্ত্রণে। চীনের অভিজ্ঞতা ওঁর কাছে অতিপ্রিয় সম্পদের মতো। কথার মাঝে-মাঝেই চলে যান চীন প্রসঙ্গে। ১৯৭১ সালে হেমাঙ্গ বিশ্বাস গঠন করেন "মাস সিঙ্গার্স"। গণসংগীতের এই দলটি আজও সক্রিয়। ষাটের দশকের বিখ্যাত নাটক উৎপল দত্ত-পরিচালিত 'কল্লোল'-এর সুরকার ছিলেন উনি। সম্প্রতি কলকাতায় পি-এল-টি আবার মঞ্চস্থ করেছেন 'কল্লোল'-কে। প্রশ্ন রেখেছিলাম—'কেমন লাগল

এবারকার কল্লোল?' শীর্ণ ডান হাত দিয়ে বুক চেপে ধরেন শ্রীবিশ্বাস, 'বুকে ব্যথা নিয়ে ফিরে এলাম।' পরের প্রশ্ন ছিল, 'কেন?' উত্তর দিতে এক মুহূর্তও সময় নেন নি হেমাঙ্গবাবু —'আগের কল্লোলের স্কেলিটন এটা।'

গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, গণসংগীত আর গণসংস্কৃতির জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হেমাঙ্গ বিশ্বাস আজ জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিকে তাকিয়ে প্রায় দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়েই বলে ওঠেন, 'Truth is sometime alone'। কথাটা মাও সেতুঙের। কিন্তু দীর্ঘ চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা-পুষ্ট এই মানুষটি আজ ভারতবর্ষের, বিশেষ করে পশ্চিম-বাঙলার, প্রায় প্রতিটি মার্কসবাদী সংগঠনের প্রতিই আস্থাহীন। অবশ্য ওঁর চেতনাপ্রবাহে আজও বয়ে চলেছে মার্কসবাদী বিশ্বাস। হয়তো তা নিঃসঙ্গ আজ। এদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস বিশ্লেষণে বসে উনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির স্ববিরোধী বহমানতাকে আক্রমণ করেন এক অনুকরণীয় অকপটতা নিয়ে। এমনকি যে আই-পি-টি-এ আজও প্রতিটি মার্কসবাদীর গর্বের বিষয় তাও ওঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে এক ভিন্নধর্মী গণ-উদ্যোগ হিসেবে। হেমাঙ্গবাবুর ভাষায়: 'আই-পি-টি-এটা কোনো মার্কসবাদী সংগঠন নয়। I differ, I very strongly differ। সুধীবাবু লিখেছেন "Marxist cultural movement". It was not a Marxist cultural movement, it is a misnomer to call it a Marxist cultural movement. It was people's cultural movement." গত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিপুল জয়কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উনি বলেন, 'চাঁদ সওদাগরের মতো জনগণ বামহস্তে ভোট দিয়েছে, দক্ষিণ হস্তে নয়।' আর নকশালবাদী রাজনীতির প্রসঙ্গ আসতেই হেমাঙ্গবাবু একটু বিমর্ষ হয়ে যান, 'তেলেঙ্গানার পর প্রথম একটা কৃষক আন্দোলন; অথচ স্রেফ গোঁড়ামি এবং বাস্তববোধহীন রোমানটিকতার জন্য শেষ হয়ে গেল।'

লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের এনসাইক্লো-পিডিক দক্ষতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কিন্তু এই সংগীতসাধক নিন্দুকহীন নন। বহু মানুষের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছার পাশাপাশি ওঁর জীবনকে ঘিরে রেখেছে অবজ্ঞা আর বঞ্চনার কুটিল হাত। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের প্রধান শরিক এক দুর্জ্ঞেয় কারণে শ্রীবিশ্বাসের প্রতি বিরূপ। হেমাঙ্গবাবুর কথা শুনে অন্তত তা-ই মনে হয়। আজকের সি-পি-আই-(এম) নেতৃবৃন্দের অনেকেই ওঁর অতীতের সহকর্মী—একান্ত প্রিয় কমরেড। অথচ আজ মতাদর্শের বিচারে সহস্র যোজন দূরে। শ্রীবিশ্বাসের গলায় ক্ষোভ ফুটে ওঠে: 'শিল্পী হিসেবে আমার ইনডিভিজুয়ালিটি-কেও স্ট্যান্ড করতে চায় না সি-পি-আই-(এম)-এর বর্তমান নেতৃত্ব।' আমাদের দেশে প্রগতিশীল এবং প্রতিবাদী শিল্প-চর্চার আঙিনায় মুষ্টিমেয় যে কজন মানুষ শিল্পসংস্কৃতিকে গণমুখী করবার তাগিদে যাবতীয় আঙ্গিককে ব্যবহার করতে চেয়েছেন এক বিজ্ঞান-নির্ভর এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, হেমাঙ্গ বিশ্বাস নিঃসন্দেহে সেই বিরল ব্যক্তিদের অন্যতম। ফর্ম্ আর কনটেন্টের বস্তাপচা দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে উনি যখন বলেন, 'প্রয়োজনমতো আধুনিক, রক, পপ, এবং স্প্যানিশ গীটার, বঙ্গো প্রভৃতির গুণাবলীও গণসংগীতে আত্মীগত করতে হবে; এইগুলির মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে, জন-চিত্তকে দোলা দেবার উপাদান আছে, তা ব্যবহার করতে হবে।'—তখন ওঁর বাস্তববোধ এবং দূরদৃষ্টি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল না হয়ে উপায় থাকে না।

গত মে মাসের এক সকালে হাজির হয়েছিলাম হেমাঙ্গ-বাবুর বাড়িতে। দীর্ঘ সময় ধরে আমার বহু প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বার্ধক্য এবং অসুস্থতাও ওঁর প্রাণপ্রাচুর্যকে ম্লান করতে পারে নি। এটা ঠিক সাক্ষাৎকার নেওয়া নয়। বরং বলা যেতে পারে আলাপচারী—এবং সেটাই সম্ভবত সংগত হবে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতা দেখে অবাক হয়েছি। নিবন্ধের পরবর্তী পর্যায়ে ওই লোভনীয় সকালের কথোপকথনের কিছু নির্বাচিত অংশকে প্রশ্নোত্তররূপে তুলে ধরা হল।

প্রশ্ন—কিভাবে এবং কোন্ সময় থেকে আপনার সংগীত-চর্চা শুরু হয়েছিল? গণসংগীতের জগতে কিভাবে এলেন? আই-পি-টি-এর সঙ্গে যুক্ত হবার প্রথম পর্যায় সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর—কিভাবে এবং কোন্ সময় থেকে আমার সংগীত-চর্চা শুরু হয়েছিল বলা মুশকিল। তবে অবশ্যই সেটা ছেলে-বেলায়। আমার জন্মস্থান সিলেট। হবিগঞ্জ মহকুমার মিরাশী গ্রামে আমার ছেলেবেলা কেটেছে। বাবা ছিলেন জমিদার এবং আক্ষরিক অর্থেই সামন্ততন্ত্রের প্রতিনিধি। আমার মা খুব ভালো গান গাইতেন। সম্ভবত ওঁর কাছ থেকেই পেয়েছি গানের প্রতি আকর্ষণ। ওই সময় স্কুলে যাবার পথে গান

গাইতাম। এটাকে ঠিক সংগীতচর্চা বলা না গেলেও ওই সময়ই আমার গানের জগতে হাতেখড়ি হয়েছিল। ছেলে-বেলায় দেখা অনেক সাধারণ শিল্পীও আমাকে সংগীতজগতের প্রতি আকৃষ্ট করতে সাহায্য করেছেন। গগন ঢুলি, কৈলাস, হরি আচার্য প্রমুখের নাম গেঁথে আছে মনে। হরি আচার্য তো পূর্ব বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবিয়াল। আরো কত কথা মনে পড়ছে—কত মানুষের নাম! এঁদের মধ্যে থেকেই তো আমার সংগীতপিপাসু মন ধীরে-ধীরে ম্যাচিওরিটির দিকে এগিয়ে গেছে। আজকের হেমাঙ্গ বিশ্বাস এঁদের কাছে বিভিন্নভাবে কৃতজ্ঞ এবং ঋণী।

সাধারণ সংগীতচর্চা থেকে গণসংগীতের জগতে চলে আসার পিছনে যে ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে তা হল সেই সময়ের রাজনীতি। আই-পি-টি-এর জন্মের আগে থেকেই আমার রাজনীতি-সচেতন সংস্কৃতিচর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯২৯-৩০ সাল থেকেই আমি আসামের সুরমা উপত্যকার নানারকম গণমুখী সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। সেটা ছিল স্বদেশী যুগ। ওই সময় আমাদের মনে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। একদিকে গান্ধীজীর আন্দোলন, অন্যদিকে বিপ্লববাদীদের আন্দোলন। দুটোই আমাকে টানত। হরিবাবু নামে হবিগঞ্জের এক মোক্তার গান লিখতেন আর আমরা গাইতাম। গান্ধীর ডাণ্ডি মারচের সময় একটা গান ছিল, 'গান্ধী-সজ্জিত বিরাট বাহিনী / নির্ভয়ে চলিছে বাধা নাহি মানি / ভারতের মুক্তি কাম্য আমাদের / এসো এসো সৈনিক ডাকিছেন সেনানী।' মূল গায়ক ছিলাম আমি। এগুলি আমাদের স্থানীয় সৃষ্টি। সে সময় আমার একজন সহশিল্পী ছিলেন—নাম গোষ্ঠবিহারী দাস চৌধুরী। এইসব গান আমি ছাত্রাবস্থাতেই গাইতাম। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছাড়াও ওই পিরিয়ডে আমাদের চেতনায় রবীন্দ্রনাথেরও প্রভাব ছিল। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবিশারদের লেখা একটা গান খুব বিখ্যাত হয়েছিল। একটা ফোর্স্ ছিল গানটির কথায়: 'বেত মেরে কি মা ভোলাবে / আমরা কি মার সেই ছেলে? / দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি / কে পালাবে মা ফেলে?' ওই দিনগুলির কথা বলতে গেলেই আমার বার-বার মনে পড়ে মুকুন্দ দাসের নাম। খুব ছোটোবেলায় আমি প্রথম দেখি ওঁকে। আমার কিশোর মনে দারুণ ছাপ ফেলেছিলেন মুকুন্দ দাস। মুকুন্দ দাসকে ভুলে গিয়ে আমরা গণসংগীত করব—এ হতে পারে না। উনি ছিলেন সবচেয়ে বড়ো মোবিলাইজার অব দ্য ম্যাসেস। আমার গান গাওয়াতে একটা অভিনয়ের ঢঙ আছে। সম্ভবত এটা মুকুন্দ দাসের কাছ থেকেই পেয়েছি। এ ছাড়াও আমার সংগীতজীবনে, অসমীয়া গান শিক্ষার ক্ষেত্রে বিমলাপ্রসাদ চালিহা এবং জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার দান অনস্বীকার্য। এ ব্যাপারে আমি জ্যোতিপ্রসাদের কাছে ভীষণভাবে ঋণী। ১৯৩০ সালে স্বদেশী করার দায়ে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামের নওগা এবং গৌহাটি জেলে বেশ কিছুদিন ছিলাম। জেলে থাকার সময়ই বিমলাপ্রসাদ চালিহার কাছে আসামের বনগীতি শিখি। এরপর মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার সময় থেকেই আস্তে-আস্তে কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে থাকি। স্বাভাবিকভাবেই গণসংগীতচর্চাতেও এর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিরিশের দশকের শেষদিক থেকে, ১৯৩৮-৩৯ সাল থেকেই আমার গানে কিষাণ মজদুর-এর কথা এসে যায়।

আই-পি-টি-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রথম পর্যায় সম্পর্কে বলতে গেলে ওই সময়ের বিক্ষুব্ধ ইতিহাস সম্পর্কেও কিছু বলা উচিত। তিরিশের দশকে স্পেনের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধি-জীবীদের আত্মদান সারা পৃথিবীতে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা নতুন দায়বদ্ধতার প্রেরণা জুগিয়েছিল। ওই সময়ই আমাদের দেশে গঠিত হয় প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ এবং সর্বভারতীয় কৃষকসভা। এরও প্রায় বছর সাত-আটেক পরে ১৯৪৩ সালে গণনাট্য সংঘের জন্ম। ওই পিরিয়ডটাতে আমি খুব অসুস্থ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আসলে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার সময় থেকেই আমি এবং আরো অনেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। যাদবপুর হাসপাতাল থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে, গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়ে চাষীদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করি। এই সময়ই বাবার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয় এবং শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসি ঘর ছেড়ে। সুরমা উপত্যকার কৃষক-আন্দো-লনের পটভূমিকায় তৈরি হয় 'সুরমা ভ্যালি কালচারাল ট্রুপ'। আমি ছাড়া ছিলেন খালেদ চৌধুরী, গোপাল নন্দী, নির্মলেন্দু চৌধুরী, মায়া গুপ্ত প্রমুখ। সে এক সময় গেছে। সিলেট আই-পি-টি-এর সভাপতি সত্যভূষণ চৌধুরী এবং প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘের সভাপতি বিনোদ চক্রবর্তী আমাদের নিয়মিত উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। বিনোদবাবুর নাটক "রক্তের লেখা"য় আমি সুর দিলাম। এই সময় কলকাতার সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ ছিল। আমি আর নির্মলেন্দু বিয়াল্লিশের শেষদিকে বা তেতাল্লিশের গোড়ায় কলকাতায় আসি ফ্যাসিবিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘের

সমাবেশে যোগ দিতে। ওদিকে আসামও তখন এক উর্বর ক্ষেত্র। আমি এলাম আসামে। তৈরি হল আসাম আই-পি-টি-এ। সভাপতি হলেন জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা। পরে সভাপতি হয়েছিলেন কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা। আমি তখন উৎসাহের তুঙ্গে। তারপর থেকে তো আছিই এই আন্দোলনের সঙ্গে।

প্রশ্ন : গণসংগীতচর্চায় বিনয় রায়, সলিল চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র প্রমুখের ভূমিকা এবং দান সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর : এঁরা তো গণনাট্য আন্দোলনের চিরস্মরণীয় নাম। সলিল একটু পরে এসেছে, কিন্তু বিনয় রায়, জ্যোতিদা—এঁরা সব সমনামায়িক। কিন্তু তা ছাড়াও তো আরো অনেকের নাম আছে। এই আন্দোলনে দান আছে আরো অনেকের। প্রথম দিকে দু-তিনটে সফল গান লিখেছিলেন হরিপদ কুশারী নামে একজন। ঠিক সেইরকম জনতার মধ্যে থেকে এসেছেন নিবারণ পণ্ডিত আর শ্রমিকশ্রেণী থেকে এসেছেন সনাতন মণ্ডল এবং গুরুদাস পাল। গণসংগীতের কথা বলতেই ভাবা হয় বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং সলিল চৌধুরীর নাম। আমি এটাকে ফুল শিকচার বলে মনে করি না। কারণ একটা-দুটো গান লিখেও দারুণ সাহায্য করেছেন অনেকে। তবে যাঁরা সফল তাঁদের নামটাই থেকে যায়। এঁদের সম্পর্কে বিশেষ করে আর কী বলব। সলিল তো এখনো বেঁচে আছে—পশ্চিমবঙ্গে আই-পি-টি-এ মুভমেনটে তার দান সবচেয়ে বেশি এই অর্থে যে, একটা সময় সে স্টীড করে রেখেছে গোটা আন্দোলনকে। এখন করে কিনা সেটা পরে আলোচনা হবে। এর পর আসে বিনয় রায়ের নাম। একটা কমপোজারের যে রোল থাকা উচিত তা তার ছিল। সে পারত একটা গ্রুপকে লীড করতে। গানের গলা খুব ভালো ছিল বিনয়ের, গান নিয়ে যে অভিনয় করা যায়, এটা বিনয় জানত। বেশি গান রচনা করে নি বিনয় রায়, কিন্তু যে-কটা করেছে—দারুণ। ওর গলা ছিল খুব মিষ্টি—শুধু ইমপ্রেসিভ নয়, পারসুয়েসিভ—যেন টেনে নিচ্ছে মানুষকে। তার পরে তো সেনট্রালে চলে গেল বিনয়। পি. সি. যোশী ওকে কেন্দ্রীয় স্কোয়াডে নিয়ে গেলেন সেখানকার অরগানাইজার হিসেবে। আর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ছিলেন স্বভাবে, চরিত্রে—সব দিক দিয়ে টপ; গানের মধ্যে যে হারমনি করা যায় সেটা শুরু করেন জ্যোতিদা। পরে সলিল সেটাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। সলিলের পূর্বসূরী হলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। যেমন ভাষার উপর তেমনি ক্লাসিকাল রাগরাগিণীর উপর দখল ছিল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের—যেটা আমার বা বিনয়ের ছিল না। মূল মিউজিকটাই ভালো জানতেন বটুকদা (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র)। আসলে উনি তো ছিলেন কবি, ওঁর "মধুবংশীর গলি" আবৃত্তির জগতেই একটা নতুন সুর নিয়ে এসেছিল। বটুকদা আবার খুব ভালো পারফরমার ছিলেন না, He was a man—সোনা! আর বিজন? বিজনও গান লিখেছে—কয়েকটা গান তো সত্যিই অসাধারণ।

প্রশ্ন : গণসংস্কৃতির প্রকৃতি এবং স্বরূপ সম্পর্কে আপনার মতামত একটু বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : আচ্ছা, এইগুলিকে আমরা গণসংগীত বলি কেন? কে নাম দিল আমি জানি না। একটি প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম : 'প্রকৃত পক্ষে স্বাদেশিকতার ধারা যেখানে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার মহাসাগরে গিয়ে মিশেছে সেই মোহনায় গণসংগীতের জন্ম'। গণসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আসলে সোভিয়েত বিপ্লবের সফলতায় গোটা পৃথিবীই ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার পালটা হিসেবে একটা শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখতে শিখল। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিল শ্রমিকশ্রেণী। শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ আর পার্থচরিত্র না থেকে প্রধান চরিত্র হয়ে উঠল। এখান থেকেই হয়তো গণসংস্কৃতির জন্ম। কাজেই খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, যে সংস্কৃতি শোষণকারী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে শোষিত মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে সাহায্য করে তাকেই বলব গণসংস্কৃতি।

প্রশ্ন : আই-পি-টি-এ আন্দোলনের আপনি একজন প্রথম সারির ব্যক্তিত্ব। ভারতবর্ষে গণনাট্য আন্দোলনের সাফল্য, ব্যর্থতা এবং বিভিন্ন সময়ে এই আন্দোলনের স্ববিরোধী বহমানতাকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করেন?

উত্তর : স্ববিরোধিতা যদি আমাদের রাজনীতিতে থাকে, এবং স্ববিরোধিতা যদি গণ-আন্দোলনে থাকে, তাহলে সেটা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হবে, এতে আশ্চর্যের কী আছে? কিন্তু কথা হল, আমরা যারা আই-পি-টি-এ আন্দোলনকে পরিচালনা করেছি, তারা অধিকাংশই ছিলাম কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বা সিমপাথাইজার, এবং অত্যন্ত সচেতনভাবেই। পার্টি যখন তার লাইন বদলায় তখন কেন্দ্রীয় কমিটি বা পলিটব্যুরোর মারফত সেই পরিবর্তিত লাইনের নির্দেশনামাকে আমরা পার্টির মেম্বাররা স্বীকার করে নিই।

এ পর্যন্ত কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না, কিন্তু আই-পি-টি-এ-কে একটা গণসংগঠন বলার পরও বারবার পার্টি চেষ্টা করেছে নিজের পছন্দমতো এর অভিমুখকে পরিচালিত করতে। এবং সেটা করতে গিয়ে বারে-বারে ভুল হয়েছে—ক্ষতি সাধন করেছে একটা ব্যাপক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের। আমার মনে হয়, আই-পি-টি-এ ছিল একটা ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মঞ্চ যেখানে বহু শিল্পী এসে জমা হয়েছিলেন এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। এঁদের মধ্যে অনেকেই কমিউনিস্ট ছিলেন না। অথচ এঁদের ট্যালেন্ট প্রশ্নাতীত। এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই যে আমাদের অর্থাৎ কমিউনিস্টদেরই ট্যালেনট বেশি ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি আসামের শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পী জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার নাম। উনি কংগ্রেসি ছিলেন, কংগ্রেসের লেফট গ্রুপে ছিলেন। আমি যখন সুরমা ভ্যালি কালচারাল স্কোয়াড নিয়ে যাই জ্যোতিপ্রসাদ তখন দ্বিধাহীন ভাষায় তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ওই স্কোয়াডের নেতৃত্ব ছিল কমিউনিস্ট পার্টির হাতে, তা সত্ত্বেও ওঁর বাধে নি এই সাংস্কৃতিক প্রয়াসকে প্রশংসা করতে। জ্যোতিপ্রসাদকেই সভাপতি করে তৈরি হয়েছিল আসাম আই-পি-টি-এ। আমি ছিলাম সম্পাদক। কমিউনিস্ট নন এমন অনেকেই ছিলেন সেই সংগঠনে—যেমন, মগাই ওঝা, ভূপেন হাজারিকা, ব্রজেন বড়ুয়া, অনিল দাস প্রমুখ। আসলে এইসব মানুষের শিল্পী-সত্তা এবং আমাদের উদ্যম একটা আত্মীয়তা তৈরি করতে পেরেছিল। এটাকে সম্পূর্ণভাবে কোনো আদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কিছুটা ভুল করা হবে। আই-পি-টি-এ-টা কোনো মার্কসবাদী সংগঠন নয়। I differ, I very strongly differ. সুধীবাবু লিখেছেন "Marxist cultural movement." It was not a Marxist cultural movement, it is misnomer to call it a Marxist cultural movement. It was people's cultural movement. অবক্ষয়িত সামন্ততান্ত্রিক আর সাম্রাজ্যবাদী ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে শিল্প-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে নবচেতনা আনার জন্যই আমরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলাম। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি সেই সত্যটাকে উপলব্ধি করতে পারে নি। বারবার চেষ্টা করেছে পার্টির লাইনের দৃষ্টিকোণ থেকে আই-পি-টি-এ-কে বিশ্লেষণ এবং পরিচালনা করতে। স্বাভাবিক কারণেই ব্যাহত হয়েছে এর স্বতঃস্ফূর্ত গতি। পার্টির স্ববিরোধ এবং ভুলের শিকার হতে হয়েছে আই-পি-টি-এ-কে। রাজনৈতিক চেতনা ছাড়া কোনো সাংস্কৃতিক আন্দোলনেই যথার্থ বিকাশ সম্ভব নয়, কিন্তু সব সময় পার্টির লাইনকে তুলে ধরতে হবে—এই মানসিকতা থাকাটাও ঠিক না। আই-পি-টি-এ-এর ক্ষেত্রে যা হয়েছে আর কী। এ প্রসঙ্গে একটা কথা না বললে অন্যায় হবে। নানারকম দুর্বলতা, স্ববিরোধ এবং দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে গণসংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে আই-পি-টি-এর দান প্রশ্নাতীত। আই-পি-টি-এর মঞ্চে দাঁড়িয়েই এদেশের শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা মেহনতি মানুষের কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। They identified themselves with the causes of the toiling masses। এর আগে এত ব্যাপকভাবে এ-ধরনের চেষ্টা লক্ষিত হয় নি। আই-পি-টি-এর সার্থকতা সম্ভবত এইখানে।

প্রশ্ন : আই-পি-টি-এর ভাঙনের মূলে কোনো মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব কাজ করেছিল কি?

উত্তর : মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব আই-পি-টি-এতে প্রথম থেকেই ছিল। আগেই বলেছি আই-পি-টি-একে আমি মার্কসবাদী সাংস্কৃতিক সংগঠন বলে মনে করি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে আই-পি-টি-এর কোনো আলোচনাই সম্পূর্ণ নয়। আই-পি-টি-এ-তে যেসব শিল্পী এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই কমিউনিস্ট মতাদর্শে কমিটেড ছিলেন না, এ কথাও বলেছি। কিন্তু নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই পার্টির মেমবার, এবং গণনাট্য আন্দোলনের সুতোটাও বাঁধা ছিল পার্টির সঙ্গে। পার্টি চেষ্টা করেছে আই-পি-টি-এর নেতৃত্ব দিতে। কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবার মতো যোগ্যতা তাঁদের ছিল না। এঁরা জানতেন না যে ট্রেড ইউনিয়ন বা কৃষক ফ্রনট চালানো আর কালচারাল ফ্রনট চালানো এক জিনিস নয়। স্বভাবতই বহু শিল্পীর চোখে এটা ভালো ঠেকে নি। এইসব নন-পার্টি বুদ্ধিজীবীদের কিভাবে ব্যবহার করা যায় পার্টি তা একবারও ভাবে নি। দ্বন্দ্ব বা সংঘাত এক্ষেত্রে অনিবার্য ছিল। আর এ ধরনের দ্বন্দ্ব সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত না হলে ভাঙনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন : গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম যুগের দিকপালদের অনেকেই পরবর্তী কালে ধর্মচ্যুত হয়েছেন। এই ডিভিয়েশন বা পদস্খলনের একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

উত্তর : এটা সত্যি যে আই-পি-টি-এ-র প্রথম যুগে যেসব

শিল্পী খুব সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই পরে এই আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন। এর ফলে গোটা আন্দোলনটাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন এটা হল, কেন এঁরা সরে গেলেন, কেনই বা আই-পি-টি-এ পারল না এঁদের ধ'রে রাখতে—সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে যেসব সত্যের (fact) মুখোমুখি হতে হবে তা খুব প্রীতিকর নয়। সব-ক্ষেত্রেই যে এটা পদস্খলন বা ডিভিয়েশন আমি তা মনে করি না। অনেকেই এসেছিলেন এই মঞ্চের গণতান্ত্রিক চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। কিন্তু পার্টির পরোক্ষ প্রভাব অত্যধিক প্রকট হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা অনেকেরই ভালো লাগে নি। স্বভাবতই তাঁরা বেরিয়ে যান। তার মানেই এই নয় যে এঁরা প্রত্যেকেই শোধনবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে চাই শম্ভু মিত্রের নাম। বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজনকে বাদ দিলে নাটকের ক্ষেত্রে ওঁর মতো সফল ও প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব গোটা বামপন্থী শিল্পচর্চার ক্ষেত্রেই আসে নি। শম্ভু মিত্রকে শোধনবাদী বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আখ্যা দেওয়া সহজ, কিন্তু ওঁর কাছ থেকে আমাদের যে কতকিছু শেখার আছে তা একবারও ভেবে দেখা হয় না। শুনেছি খোদ মস্কো থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন শম্ভু মিত্র। এখন তাহলে কী বলবেন ওঁর বিরোধীরা! আসল কথা হল, শিল্পীর একটা স্বতন্ত্র সত্তা থাকে, তাকে অস্বীকার করে কোনো গণমুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলনই সফল হতে পারে না। পার্টি গাইড করতে পারে, কিন্তু ডিকটেট করতে পারে না। অবশ্য এক্ষেত্রে আরও একটা কথা বলার আছে যে, বিভিন্ন সময়েই আই-পি-টি-এ-কিছু লোক নিজেদের কেরিয়ার প্রতিষ্ঠার মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আমি কারো নাম করতে চাই না, কিন্তু এ ঘটনাও বিরল নয়।

প্রশ্ন : নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর : নকশাল আন্দোলনে বহু ছেলে মৃত্যুবরণ করেছেন। এঁদের সততা এবং চেষ্টার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও বলতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই যে এটা ব্যয় হয়ে গিয়েছে। তেলেঙ্গানার পর প্রথম একটা কৃষক-আন্দোলন; অথচ স্রেফ গোঁড়ামি এবং বাস্তববোধহীন রোমানটিকতার জন্য শেষ হয়ে গেল। আজকাল যাঁরা এই আন্দোলন নিয়ে মাতামাতি করেন তাঁরা তো বাবু ক্লাসের লোক—বেস সম্পর্কে কোনো ধারণাই এঁদের নেই। এসব সত্ত্বেও নকশাল আন্দোলনের একটা সফলতার দিকও আছে। আসল কথা হল বেস-এ একটা আন্দোলন হলে সুপারস্ট্রাকচার-এও তার প্রভাব পড়ে। সত্তর দশকের ঐ বিশুদ্ধ দিনগুলির জন্যই আমরা মহাশ্বেতা দেবী, মৃণাল সেন প্রমুখ শিল্পীকে নতুন-ভাবে পাই। পাই বিনয় ঘোষকে। এ ছাড়াও আরো অনেক শিল্পী-বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে নকশাল আন্দোলনের দৌলতে। নাটক-গল্প-কবিতা এমনকি গণসংগীত সব দিক দিয়েই সমৃদ্ধ হয়েছি আমরা। গণসংগীত-গায়ক অজিত পাণ্ডে তো ঐ সময়ই উঠে এসেছেন। 'তবাই কান্দে গো' তো ওই সময়েরই গান। অজয় দাসও ঐ সময় নকশালবাড়ি আন্দোলনের উপর বহু সফল গান লিখেছিলেন। উৎপল দত্ত-পরিচালিত "তীর" নাটক ওই সময়ের অন্যতম সৃষ্টি। আমি ঐ নাটকে সুর দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : ভারতবর্ষের বর্তমান আর্থ-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আপনাকে কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে?

উত্তর : ভারতবর্ষের বর্তমান প্রেক্ষাপট তো উগ্রপন্থা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং অর্থ নৈতিক শোষণের নগ্ন প্রেক্ষাপট। একজন শিল্পী হিসেবে আমি ব্যথিত। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক-চর্চাও আজ status quo-তে ভুগছে। কিন্তু কেন এমন হল? যাঁরা একদিন সমাজপরিবর্তনের কথা বলতেন, সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখাতেন, তাঁরা আজ কোথায়? নিজেকে বাদ দিয়ে বলছি না। আজ দেশের সর্বত্র যে অসন্তোষ তা তো একদিনে হয় নি। ভেবে দেখো, যে তেলেঙ্গানা একদিন কমিউনিস্টদের গর্বের বিষয় ছিল, আজ সেখানে রামা রাও এসে গেছে। যে বমবের শ্রমিক একসময় আমাদের সম্পদ ছিল আজ সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন দখল করে নিয়েছে দত্ত সামন্ত। আসলে আজ আমাদের দেশের শরীর থেকে যেসব ক্ষত আত্মপ্রকাশ করছে তার পিছনে আমাদের অর্থাৎ কমিউনিস্টদেরও দায়িত্ব কম নয়। কমিউনিস্টরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে শুধু যে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, বারবার তারা revolutionary mass-কে disarm করেছে। They have failed to play the historic role which was assigned to them by history। এটাকে তুমি কী বলবে? শোধনবাদ? প্রতিক্রিয়াশীলতা? নাকি বেইমানি? আমাদের দেশের মানুষ প্রতিবাদ করতে জানে না, এটা আমি বিশ্বাস করি না। তারা সবসময় তাকিয়ে আছে প্রতিবাদে ফেটে পড়ার জন্যে। কিন্তু কে তাদের নেতৃত্ব দেবে? কমিউনিস্ট পার্টিই

পারত এটা। কিন্তু তাঁরা তো আজ মাগ্‌গি ভাতা আর বোনাসের জন্য আন্দোলনের মধ্যেই নিজেদের আবদ্ধ রেখেছেন। একটা কথা কী জান, যখনই কোনো revolutionary tide-কে আটকে দেওয়া হয় তখনই সেই জায়গায় counter-revolutionary ক্রিয়াকলাপের জন্ম হয়। আজকের ভারতবর্ষ তারই নিদর্শন। আমি চিন্তিত, আমি ব্যথিত; কিন্তু কে শুনবে আমার কথা বা আমার মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের কথা! আজকাল আমার মাঝে-মাঝেই মাও-এর একটা কথা মনে আসে: Truth is sometimes alone। আমার জীবন এবং উপলব্ধির ক্ষেত্রে কথাটা বড়ো সুন্দরভাবে মিলে গেছে।

এই সংখ্যায় বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে কাজী আবদুল ওদুদের 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। জুলাই সংখ্যার বিজ্ঞপ্তিতে লেখকের নাম ভুলবশত হুমায়ুন কবির ছাপা হয়েছিল। এর জন্য আমরা বিশেষ লজ্জিত।—সম্পাদক